আমার বন্ধু সুভাষ

শ্রীদিলীপকুমার রায়

অনুবাদক—গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য

মিত্রালয়
১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা
১৯১৩

—তিন টাকা—

মিত্রালয় ১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট হইতে গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত
ও গুপ্তপ্রেশ ৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন হইতে শ্রীফনিভূষণ হাজরা কর্ত্তৃক মুদ্রিত

আমার বন্ধু সুভাষ

এক

১৯১৩ সাল,—আমি প্রবেশিকার ছাত্র, মেট্রপলিটন স্কুলে পড়ি। সামনেই পরীক্ষা, দিনরাত তার তোড়জোড়, প্রস্তুতি চলেছে—কেবল লেখাপড়ার কথা ছাড়া আর কোনো আলোচনাই কেউ করে না। পড়া মুখস্থ করতে সবাই ব্যস্ত—এবারে খা যাবে কার কত দৌড়। বাহাদুরির নেশা নেই কার? বিশেষ ক'রে রীক্ষায় নিজের কৃতিত্ব প্রচারিত হোক, একটা অক্ষয় কীর্তির মত কাজ ক'রে রেখে তে পারি এটা কার না সাধ যায়। তবে আমার নিজের সম্বন্ধে খুব ভরসা ছিল —সত্যি কথা বল্‌তে কি, তেমন উৎসাহও ছিল না অসাধারণত্ব প্রমাণের জন্য। র চেয়ে ঢের বেশি আকর্ষণ আমার—গানে। সারাদিন ইস্কুলের পড়াশুনার ঝড়ের র সন্ধ্যায় যখন কানে আসত সুরের মধুঝঙ্কার তখন সেই স্বপ্নাশ্রয়ী কিশোরমনের আনাচে-কানাচে নবচেতনার সাড়া উঠত জেগে।

আমাদের ক্লাসে ক্ষিতীশ চট্টোপাধ্যায় ছিল সবচেয়ে ভালো ছেলে,—তার সম্বন্ধে আমার বয়সোচিত শ্রদ্ধাও ছিল, কারণ অনেক চেষ্টা ক'রেও কোনোদিনই তাকে ডিঙিয়ে প্রথম স্থানটা দখল করতে পারিনি আমি। বরাবরই তার পিছু পিছু দ্বিতীয় স্থানটিতে আমায় আটকে থাকতে হয়। অতএব ক্ষিতীশ বুদ্ধিমান্‌ এবং অসাধারণ।

এ হেন ক্ষিতীশকে যদি কেউ অবজ্ঞা করে তাহ'লে আমার রাগ হ'তেই পারে। সেদিন হঠাৎ নিবারণ আচম্‌কা একটা কথা ব'লে বসল: "রেখে দে তোদের ক্ষিতীশকে—আমাদের কটকে রাভেন্‌শ স্কুলে সুভাষ ব'লে একটি ছেলে পড়ে তার ক'ড়ে আঙুলের নখের কাছেও ক্ষিতীশকে ঘেঁষতে হয় না। জানকীনাথ বোসের ছেলে সুভাষ, হীরের টুক্‌রো ছেলে। এই ব'লে দিলাম, ক্ষিতীশ তার কাছে স্রেফ নট্‌ কিচ্ছু নাথিং।" নিবারণ আমাদেরই সঙ্গে পড়ে, তবে তার বাড়ি কটকে।

তার একথায় আমরা কেউই খুশি হইনি, বরং চ'টেই গেলাম। আমাদের ফার্ষ্ট বয় আর কারো কাছে মানবে হার! আর ক্ষিতীশের মত ছেলে!

আমি তার কথা হেসে উড়িয়ে দিই—"আরে তাই নাকি!"

কিন্তু নিবারণ অত সহজে দমবার পাত্র নয়, সে আমার বিদ্রূপের জবাবে হো হো ক'রে হেসে উঠল, বল্‌লে—"আচ্ছা, এই ব'লে দিলাম—লিখে রাখ্‌!"

কথাটা শুনে সুভাষ সম্বন্ধে একটু কৌতূহল হয়েছিল, কিন্তু মনে মনে কষ্টও পেয়েছিলাম। ইস্কুলের ছাত্রদের স্বভাবসিদ্ধ নিয়মেই আমার বিশ্বাস ছিল যে, আমাদের ইস্কুলের ক্ষিতীশই বিশ্ববিদ্যালয়েও প্রথম স্থান অধিকার করবে—সেই আশাতে যে সংশয়ের ধোঁকা ধরিয়ে দিলে নিবারণ! কোথাকার উড়িয়া দেশ থেকে কে একটা ছেলে এসে ক্ষিতীশকে দেবে হঠিয়ে? কথাটা ভাবতেও কান্না! আমাদের সেই শ্রুতিধর ক্ষিতীশ, যে নব্বইটা প্রবন্ধ তার বাবাকে দিয়ে ঘ'ষে মেজে লিখিয়ে নিয়ে কণ্ঠস্থ ক'রে রেখে দিয়েছে, যে দিনরাত বই নিয়েই থাকে, যার বুদ্ধি এবং মেধার তুলনা নেই—সেই ক্ষিতীশকে বলবে দুয়ো!…যে ক্ষিতীশ ইংরেজিতে নব্বই নম্বর পায়—যেখানে আমি কেঁদে ককিয়ে মাত্র সত্তর। ওদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারিনি, অনেক পিছনে বাইশ না তেইশ জনের পরে আমার নামটা ছাপা হয়েছিল। আর ক্ষিতীশ হ'ল সপ্তম।

কিন্তু একি কাণ্ড, সুভাষ যে দেখছি একেবারে দ্বিতীয় স্থানে চন্দ্রভাল! সেবারে প্রথম হ'ল মিত্র ইন্‌স্‌টিউসনের প্রমথ সরকার।…আমার মাথার চুলগুলো যেন সোজা দাঁড়িয়ে উঠল—তাজ্জব ব্যাপার। সুভাষ সত্যিই ক্ষিতীশকে বল্‌ল—"তুই কে রে!"

অবশ্য প্রমথ সরকারের কথা আমার মনেই রইল না। আমার লক্ষ্য হ'য়ে রইল ঐ সুভাষ।

নিবারণ বললে: "কী? এবার?"

ব'লে সে কী খিলখিলিয়ে হাসি! আর সঙ্গে সঙ্গে আমাকে পরাভূত দেখার সে কী গর্ব। কিন্তু কেন যে আমি ঠাউরে পাই নি অদ্যাবধি। কারণ নিবারণ ও সুভাষ দুটি আলাদা মানুষ ব'লেই আমার ধারণা—কাজেই একজনের স্বোপার্জিত গৌরব অপরের অধিকারে এল কোন্‌ আইনে ভেবে পাওয়া ভার।

কিন্তু সে যাই হোক এই ঘা খেতে না খেতে কটকের "হীরার টুকরো" হ'য়ে উঠল আমার কাছে অবিস্মরণীয়। আমার "হিরো" বদলে গেল রাতারাতি।
বালকমনের রীতিই এই—সে অতি সহজেই নূতনকে বরণ ক'রে নেয়, জেনেও যে তাতে পুরাতনে হবে অঙ্গহানি। রাতারাতি সুভাষের ভক্ত হ'য়ে উঠলাম আমি।
এমনি ভাবেই আমি সুভাষের দিকে প্রথম আকৃষ্ট হই। সঙ্গে সঙ্গে সুভাষ সম্বন্ধে নানা কথা জানবার চেষ্টা করি। তখন আমার গতিবিধিতে শার্লক হোম্‌সের প্রভাব,—তাই অতি সন্তর্পণে সুভাষ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করতে লেগে গেলাম। তার সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় সব খবরই আমার কাছে মহামূল্য। ফলে আজকাল নিবারণের কথা মন দিয়ে শুনি—সে অনেক জানে সুভাষের সম্বন্ধে।
মোটামুটি নিবারণের কাছ থেকে এবং এখান ওখান থেকে যা জেনেছিলাম তাতে সুভাষ সম্বন্ধে আমার ধারণা হ'ল এই—(১) সুভাষ অসাধারণ বিদ্বান, (২) পবিত্র তার চরিত্র, (৩) তার অকলঙ্ক জীবনে কোনোদিন কোনো রমণীর ছায়াপাত হয়নি, (৪) স্বামী বিবেকানন্দের একনিষ্ঠ ভক্ত, (৫) বাল্যকালেই একবার ঘর ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছিল।—এই শেষের তথ্যটিই আমার কল্পনা ও চিন্তাশক্তিকে নিশ্চল ক'রে দিল। এত বড় বিস্ময় আমার কাছে আর কিছু নয়। দিকে দিকে সুভাষ দিক্‌পাল! তার কাছে ঐ অতিসাধারণ ক্ষিতীশ দাঁড়াতে পারে কখনো! সুভাষ সত্যই অসাধারণ,—তার অন্তরের সম্পদ ঐশ্বরিক অবদানে অনবদ্য। আমাদের সেই প্রাচীন মুনিঋষিদের মত তত্ত্বজিজ্ঞাসু তার মন।…এর গৌরব, এর মর্য্যাদাই আলাদা।
আমার যখন বারো বছর বয়স তখন থেকেই আমি শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি-পরায়ণ হয়ে উঠি। দক্ষিণেশ্বরের সেই বিচিত্র সাধকের উপলব্ধি আমার জীবনে গভীর রেখাপাত করে। তাঁর ম'ত আমারো ধারণা—"জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরকে পাওয়া—আত্মার সর্বোত্তম সিদ্ধিই সেই লীলাময়কে নিয়ে।"
আমার মনের কল্পনার আকাশে রঙীন ফানুষ ওড়ে: আমি করি দিবাস্বপ্নের বেসাতি:—আমি আর সুভাষ দু'জনে হিমালয়ের গুহায় গুহায় ফিরছি গুরুর সন্ধানে। তখন আমার একবারও মনে হয়নি যে, সুভাষ হয়ত আমার মত অধ্যাত্ম-মার্গকেই জীবনের চরম আশ্রয় ব'লে বিশ্বাস করে না। তরুণ মনের নিয়মই হচ্ছে,

নিজের খুশখেয়ালে উধাও চলা—সেখানে না থাকে যুক্তি, না থাকে বাস্তবের কঠোর সত্যের রূঢ়তা। আমি আমার খুশিমত সুভাষের মূর্তি গড়ি—আমার মনোমত আদর্শের যোলকলা তাতে আরোপ করি। বাস্তব মানুষটির যে কিছু অভাব ছিল এমন নয়—সে যে আপন স্বকীয়তায়, বৈশিষ্ট্যে, মাধুর্যে, অপূর্বতায় পূর্ণবিকাশ লাভ করেনি তাও নয়। তবে কল্পনার নিখুঁত ফুলটির সঙ্গে বাস্তবের হাজার ফুল ফুটে উঠলেও কখনো এক আসন পায় না। কল্পনা, সে কল্পনাই—আর বাস্তব, বাস্তবই। প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হ'য়ে আমি তাকে প্রথম চাক্ষুষ দেখলাম। কিন্তু সেদিন কথা বলতে পারিনি—হঠাৎ আমার হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া দ্রুত হ'য়ে গেল, কেমন যেন থতমত খেয়ে যাই। এক্ষেত্রে আলাপের প্রশ্নই ওঠে না। তাছাড়া দেবতার বেশি কাছে ঘেঁষতে যাওয়া নিরাপদ নয়—এ আমি ঐ বয়সেই বুঝতে শিখেছিলাম। সেই বয়সে হয় ত অনেক বিষয়েই আমার দৈন্য ছিল কিন্তু কল্পনার স্বেচ্ছাচারে আমার মতন নবাব কজন ?

তার সম্বন্ধে আমি আরো অনেক খুচ্‌রো খবর জোগাড় করেছি। ওরা নাকি এল্‌গিন রোডের বাড়িতে থাক্‌বে। সেখান থেকে আমাদের থিয়েটার রোডের বাড়ি দূরে নয়। ১৯১৩ সালে আমার পিতৃদেবের মৃত্যুর পর আমি মাতামহ প্রতাপ চন্দ্র মজুমদারের থিয়েটার রোডের প্রাসাদেই থাকতাম। সেখান থেকে সুভাষদের বাড়ি বড় জোর আধ মাইল।...এর পর প্রায়ই যেতাম এলগিন রোডের পথ দিয়ে, যেতে যেতে আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকত একটি বিশেষ বাড়ির দোতলার ঘরের দিকে। ওই ঘরে থাকে সুভাষ। আমার মনে হ'ত একদিন দুজনে পথে ভিখারী হ'য়ে বেরিয়ে পড়েছি—পরনে কৌপীন, আমরা সন্ন্যাসী, গান গেয়ে পথ চলি—"কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ।"

দুই

ঠিক সেই সময়ে একদিন সুপ্রভাতে সুভাষ আমাদের বাড়ি এসে হাজির! এত বড় বিস্ময়, এ আনন্দের টান আমি সামলাই কী ক'রে ? মহম্মদ পর্বতের কাছে যায়নি—তার অন্তরায় ছিল অপরিসীম দ্বিধা ও লজ্জা, তাই পর্বত আজ নেমে এসেছে মহম্মদের কাছে।

সুভাষ আমায় তাদের বিতর্কসভায় যোগ দেবার জন্যে বল্‌তে এসেছিল। বলা বাহুল্য, এ বিতর্কসভার উদ্যোক্তা এবং প্রতিষ্ঠাতা সে নিজেই।

সে বল্‌লে—"আমাদের মধ্যে তর্কবিতর্কের অভ্যাস গ'ড়ে তুল্‌তে হবে। কারণ এ দেশে বড় বড় বক্তা, বাক্‌-যোদ্ধার বিশেষ প্রয়োজন—মানে, স্বাধীনতার জন্যে মুখপাত্র..."

আমি হয়ত তার কথাগুলি হুবহু উদ্ধৃত করতে পারব না, কারণ এতদিন পরেও ঠিক সেই শব্দগুলি মনে রাখা সম্ভব নয়—কাজেই আমার মনে যা আছে, সে যে ধরণের কথা বলেছিল, তাই বলব। মোট কথা, ভাষার পার্থক্য থাকলেও তার বক্তব্যের মূল ভাবার্থ বিকৃত হবে না, এটা আমি জোর ক'রে বল্‌তে পারি। আমি তাকে দীর্ঘদিন ধ'রে অন্তরঙ্গ ভাবে দেখেছি, তার আদর্শবাদ সম্বন্ধেও আমি অত্যন্ত ওয়াকিবহাল—তাই জানি, এবং বল্‌তে পারি যে, এ ধরণের ভুল হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

"তর্ক যুদ্ধ ?"—আকাশ থেকে পড়লাম।

খানিকটা সাম্‌লে নিয়ে বলি—"কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ কি বলেন নি যে, তর্ক দিয়ে কখনো সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় না ?"

—"তিনি কি বলেছিলেন, তাতে আমাদের দরকার কি ?" অধীরভাবে বল্‌লে সুভাষ,—"আমরা চিরকাল সেই অতীতকে আঁকড়ে থাকব না, থাকতে পারি না। আমাদের হিন্দুসভ্যতা ও সংস্কৃতির সবচেয়ে ক্ষতি করেছে tradition সংস্কার। আমাদের গ'ড়ে তুলতে হবে ভবিষ্যৎকে। কেন, আপনার বাবা কি বলেন নি :

চোখের সামনে ধরিয়া রাখিয়া অতীতের সেই মহা আদর্শ,
জাগিব নূতন ভাবের রাজ্যে রচিব প্রেমের ভারতবর্ষ ?"

"তাঁর কবিতা আপনার মনে আছে ?"

"অন্তরে গাঁথা আছে।"—সুভাষের দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। "তাঁর মত স্বদেশী কবি দুর্লভ। আপনার ওই প্রাচীন মামুলিবাদীদের দিক থেকে কিছু ভক্তি সরিয়ে এনে আপনার পিতার গৌরবে অধিকতর গর্বিত হয়ে উঠুন।"

আমি রীতিমত ধাঁধায় প'ড়ে গেলাম। অবশ্য সুভাষের কথাটা খুবই ভালো লাগল এবং সত্যি কথা বল্‌তে কি সে আমার কাছে আরো প্রিয় হয়ে উঠল—কিন্তু

শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে আমার পিতৃদেবকে তুলনা করতে ভরসা হয়নি। তা তিনি মামুলি কথাই বলুন বা যাই হোন। আমার পিতৃদেবকে আমি সেদিনও ভক্তি করতাম, আজও তাঁর সম্বন্ধে আমার শ্রদ্ধা তেমনই গভীর দৃঢ়বদ্ধ রয়েছে। কিন্তু তবু বল্‌ব: ওঁরা হলেন ঈশ্বরকোটি, এঁরা জীবকোটি। জীবকোটি যিনি, তাঁর মানসিক ঐশ্বর্য, দেশভক্তি, মানবিকতার চরম সম্পদ, সব কিছু থাকা সত্ত্বেও বল্‌বই বল্‌ব—যেহেতু সত্যনিষ্ঠা পিতৃভক্তির চেয়েও বড়—যে তাই আমি কবিকে পারিনি ঈশ্বরের প্রতীক অবতারের সঙ্গে সমাসনে প্রতিষ্ঠিত করতে। কিন্তু সেদিন সুভাষের সে কথার জবাবে চুপ ক'রে ছিলাম—কারণ কিশোর মন বিশ্বাস করলেও পারে না বিশ্বাসে আস্থা রাখতে।

আমায় চুপ করে থাকতে দেখে সুভাষ খুশি হয়েছিল বই কি।

তারপর সে বল্‌লে দৃপ্ত কণ্ঠে—"হ্যাঁ, দেশের জন্যে জীবন দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে রাখব। কিন্তু শুধু ভাবপ্রবণতায়ও ইন্ধন জোটে না। তাই আমাদের অস্ত্র-বর্ম সংগ্রহ করতে হবে, আধুনিক জগতের যোগ্য ক'রে তুলতে হবে নিজেদের।"

তার শেষ কথায় যেন ব'সে পড়লাম। সেদিনের সেই পুরাণপড়া, রামকৃষ্ণভক্ত ভক্তিপ্রবণ গায়কের মনের আনাচে-কানাচে কোথাও আধুনিকতার তিলমাত্র ঠাঁই ছিল না। সুভাষ ভুল ক'রে এসেছে আমার কাছে—ভুল ভেবে।

শেষ পর্যন্ত সে যেন আমার প্রতি করুণা ক'রেই বলল—"তা ব'লে আমি শ্রীরাম-কৃষ্ণকে অসম্মান বা অশ্রদ্ধা কর্‌ছি এমন নয়—তবে হ্যাঁ, তাঁর শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দকে আমার বেশি ভালো লাগে।"

আমি আর পারলাম না। বললাম:—"কিন্তু আমার লাগে না। বিবেকানন্দ তাঁর গুরুর কাছাকাছি স্তরে পৌঁছেছিলেন একথা আমি বিশ্বাস করি না। তা ছাড়া, একথা ত বিবেকানন্দ নিজেই কতবার স্বীকার করেছেন।"

—"সেইখানেই ত তাঁর মহত্ত্ব।" প্রতিবাদ কর্‌লে সুভাষ। "আজ বিশ্বময় শ্রীরামকৃষ্ণকে বিখ্যাত করেছেন ত বিবেকানন্দই।"

বেশ বুঝতে পারি আমার মুখ লাল হয়ে উঠেছে—আমি যেন বেশ তেতে উঠি তার এ কথায়। বলি—"কিন্তু ঈশ্বরপ্রেমী বাজারদরের পরোয়া করে না—তার দরকারও নেই।" সাধ্য কি গরম কথাকে নরম ক'রে বলি?

সুভাষের স্বভাবের মধ্যে কোথাও কাউকে অশ্রদ্ধা করবার প্রবণতা ছিল না। এদিক দিয়ে হয়ত তাকে 'আধুনিক' বলাই চলে না। সে একটু চুপ ক'রে থেকে আমায় যেন বুঝতে চেষ্টা করে।

সে যেন সন্ধি করতে চায়, বলে—"দেখুন দিলীপবাবু, ও আলোচনা এখন থাক্। আমি আপনার কাছ থেকে কথা চাই, আপনি আমাদের বিতর্কসভায় আসুন।"

এ কথায় একটু গর্ব বোধ করি-না কি আর!—কিন্তু তবু যেন ঠিক সাহস পাইনে।

—"আচ্ছা যাবো।" আমতা আমতা ক'রে :—"শুধু—মানে, আমি ভালো কথা কইতে পারিনে কিনা। কোনোদিন প্রকাশ্য সভায় আমি বক্তৃতা করিনি। কিন্তু শ্রোতা হিসেবে আমি খাসা মানুষ।"

সুভাষ হাসলে। হাসলে তাকে এত ভালো দেখায়—এত ভালো আর কিছুতে নয়। যেন রুক্ষ গম্ভীর পাহাড়ের বুকে ছল্‌ছল ঝরণার জল। একটু নাড়া দিলে, একটু তাক বুঝে ঘা দিলেই—দৃশ্য পরিবর্ত্তন। বাইরে থেকে দেখলে সুভাষকে বেশ গম্ভীর দেখায় সব সময়েই—কিন্তু আমি এই থম্‌থমে ভাবটা বেশিক্ষণ সইতে পারি না। আমার পিতৃদেবের এদিক দিয়ে খ্যাতি ছিল খুব, তিনি ছিলেন হাসির রাজা—তাঁর কবিতায়, তাঁর নাটকেও তার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি দরকার মত গম্ভীর হতেন, আবার অন্য সময়ে প্রাণ খুলে হাসতেন। সুভাষও ঠিক এমনি ধরণের ছিল। বাইরে থেকে তাকে দেখলে মনে হ'ত রাশভারি, যেন বিধাতা ওকে হাসি দেননি। হয়ত ও ছেলেবেলায় ওর মাকে প্রশ্ন করেছিল—"হ্যাঁ মা, হাসি কাকে বলে?"

কিন্তু সুভাষকে যারা একবার হাসতে দেখেছে তারা জানে যে, একবার হাসতে শুরু করলে তার পেটে খিল ধরলে তবে হাসি থামত। কিন্তু পরমুহূর্তে তার স্বভাবগাম্ভীর্য্য ফিরে আসতো আবার। তার অভাব ছিল না কিছুরই—কাজে উৎসাহ ছিল অদ্ভুত, যে কাজ সে তুলে নিত তা সফল করবার জন্যে পরিশ্রম করত সে অমানুষিক, তার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত একাগ্রতার ছাপ মাখানো, যে জিনিসটা তার মনকে পেয়ে বসত সেটা হাসিল করবার জন্যে সুভাষ সব কিছু খোয়াতে পারত—তার সে আভিজাত্য দেখেছি। কিন্তু সুভাষের স্বভাবমাধুর্য্য আমায় মুগ্ধ করেছিল। গোড়া থেকে যখন আমি সুভাষকে বীরপূজা দিই মনে মনে, তখনই অন্তরে একটা শঙ্কা ছিল যে হয়ত সে আমার কল্পনায় আঁকা ফুলটির তুলনায় কোনো

না কোনো দিক দিয়ে অপরিণত থেকে যাবে—কিন্তু শেষে দেখলাম, আমি যা চেয়েছিলাম তার ষোলআনাই পেয়েছি। তার প্রাণখোলা হাসি আমার মনে স্বস্তি এনে দিত, দিত স্বাচ্ছন্দ্য আর আনন্দ।

হাসি থামলে পরে সুভাষ বল্‌লে—"অবিশ্যি বিতর্কসভায় শ্রোতার চাহিদা আছে তবু—। আপনি শুধু শ্রোতা হিসেবে যোগ দিলে কি সেটা সত্যিকার সহযোগিতা হবে? কেবল মাত্র আদর্শ শ্রোতা দিয়ে সভার কাজ চালানো যায় কি?"

—"তা বটে। কিন্তু আমার অসুবিধে কি বুঝতেই তো পারছেন।" অনেকটা ভরসা ক'রেই বলি যেন। কথাটা যেন একটু বেশি বিজ্ঞের মত শোনালো—'অসুবিধে' কথাটা ব্যবহার করার মধ্যে যে সমস্যার ইঙ্গিত দেওয়া হ'ল তাতে নিজের সম্বন্ধে একটা গুরুত্বও জুড়ে দিলাম হয় ত।

সুভাষ যথেষ্ট বুদ্ধিমান্, বল্‌ল ঘাড় নেড়ে:—"হ্যাঁ, আমি আপনার ও অসুবিধের কথাটা বুঝেছি, আবার বুঝিনিও বলা যায়। কি জানেন, আমরা ভারতবর্ষের লোক নিজের ওপর এতটুকু ভরসা করতে পারি না, ফলে ওই অসুবিধেটা পেয়ে যায় আস্কারা। শেক্‌স্‌পীয়ার পড়ুন, নিজের শক্তির চরম পরীক্ষার জন্যে সব সময়ে তৈরী হয়ে থাকুন, দেখবেন কোথাও আপনি হঠবেন না।"

সুভাষের মুখে বইপড়া বুক্‌নীগুলো যেন মোটেই বেখাপ্পা শোনাতো না। আমরা আধুনিক যুগের মানুষ, হঠাৎ পিছিয়ে যাওয়া ভাবতেও পারি না। ঘোড়া যেমন পিছু হ'টে চল্‌তে পারে না, তেমনি আমাদেরো প্রগতি হ'তে পারে না পিছন দিকে। কিন্তু এদিক দিয়ে সুভাষের একটা অদ্ভুত দক্ষতা ছিল, সে অনায়াসে সেই ভিক্টোরিয়া-যুগের মামুলি গৎ দিয়ে আমাদের সবাইকে অভিভূত করে ফেলেছিল কেম্‌ব্রিজে। তফাতের মধ্যে ছিল, তার আচারে আচরণে আধুনিক ব্রাহ্ম ধরণের চৌকষ চাকচিক্য। অর্থাৎ কেম্‌ব্রিজে পড়বার সময় আমরা ছিলাম কাছাকাছি: খুব অন্তরঙ্গ হয়ে মেশবার সুযোগ ছিল—তা ছাড়া তখন প্রথম-পরিচয়ের প্রশংসাচ্ছন্নতার অনেকটা ঘোর কেটে গেছে। তাকে অতিক্রম ক'রে আমি সাদা চোখে দেখতে পাই, বিচারবুদ্ধির সহায়তাও অনেকটা পেয়ে গেছি। অবশ্য একথা অনেকদিন পরে বুঝতে পেরেছিলাম।

আমি একটু হেসে বলি—"হ্যাঁ কথাটা খুব খাঁটি। কিন্তু আমার অসুবিধের

কথাটা খুলে বলা হয়নি এখনো। সেই যে বাবার একটা হাসির গান আছে না—(গুনগুনিয়ে)—" আমার অবস্থা অনেকটা সেইরকম।

হ'তে পারতাম রাজনৈতিক বক্তাও অন্তত
কিন্তু দাঁড়ালেই হয় স্মরণশক্তি অবাধ্য স্ত্রীর ম'ত
(আর) মুখস্থ সব বুলি এমন বেজায় যায় সব ঘুলিয়ে
(আর) সুযোগ পেয়ে পথে দাঁড়ায় বিদ্রোহী ভাবগুলিহে
(তা) হাজার কাশি আদর করি—দাড়িতে হাত বুলিয়ে
তাই রইলাম বৈঠকখানা-বক্তা আমি চটে মটেই তো
তা নৈলে খুব এক বড়—
হ্যাঁ তা বটেই তো তা বটেই তো…

সুভাষ আবার হো হো ক'রে হেসে উঠল।

—"কিন্তু আমি আজই আপনাকে ধাঁ করে একটা বড় বক্তা হতে বলছি না। তা ছাড়া আমাদের কলেজের তর্কে রাজবিদ্রোহী শেষ পর্য্যন্ত অস্পৃশ্যই থেকে যাবে। আমি চাই যে ছেলেরা দ্রুত চিন্তা করতে শিখুক। চিন্তাশক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই আত্মপ্রত্যয় আসবে—সেটাই ত বড় লাভ। আমরা ভারতবাসীরা, পরের মুখ চেয়ে চলতেই বড় বেশি অভ্যস্ত—কাজে, কর্মে, মতামতে, কোনো কিছুর উদ্দীপনায় সবতাতেই আমরা আর-একজনের অপেক্ষায় ব'সে থাকি। তাই আমি এই বিতর্কসভার মধ্যে দিয়ে আমাদের নিজের পায়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা অর্জন ক'রে নিতে চাই।"

তার একথা আমার মনে ধরল। তার গুণই ছিল তাই—সে যেমন ক'রে হোক অপরকে নিজের দলে টেনে আনবেই—যুক্তি, তর্ক সব কিছু প্রয়োগ ক'রেও সুভাষ অন্যের আস্থা আদায় করতে পারত। আমি জানতাম ওটা আমার স্বধর্ম নয় (এবং আজও আমি বাগ্মিতাকে বড় শিল্প ব'লে স্বীকার করি না) তবু সেদিন আমি সম্মত হয়েছিলাম।

সেদিন আর কি কি আলোচনা হয়েছিল মনে নেই।

যদি বলি যে, সেদিন কথাপ্রসঙ্গে যা যা আলোচনা হয়েছিল তার হুবহু সব মনে আছে আমার, তাহ'লে সত্যের অপলাপ হবে। তবু যা বললাম তা বাজে কথা নয়।

এবং সুভাষের সেই অল্পবয়সেও যে ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয়েছিল এ তারই আংশিক পরিচয়। আঠারো বছর বয়সের ছেলের তুলনায় সুভাষের মন অত্যন্ত বেশি এগিয়ে গিয়েছিল বৈকি। সুভাষের সঙ্গে কথা বলবার সময় কেবলই মনে হত সে যেন আমাদের চেয়ে বেশ কয়েক বছর বড় এবং বিজ্ঞ। নেতৃত্ব করবার অদ্ভুত দক্ষতা ছিল তার, এ সম্বন্ধে সে নিজেও বেশ সচেতন ছিল। এই আত্মসচেতনতা তার পক্ষে কোনোদিন ক্ষতিকর হয়নি বলব না। তবে একথা স্বচ্ছন্দে বল্‌তে পারি, যারা তার নেতৃত্ব মেনে নিয়েছে, তাদের সে কোনোদিনই নিজের চেয়ে ছোট মনে করেনি। যারা বলে গত যুদ্ধের সময়ে সুভাষ ফাসিস্ত নেতার মত অধীনস্থ অনুচরদের যেন লাগাম বেঁধে অনর্থক বড় কষ্ট দিয়েছে, আমি বল্‌ব তারা সুভাষকে জানে না, দেখেনি।

আমার মনে হয়, এতক্ষণ যা বলেছি তাতে মোটামুটি বোঝা গেছে যে— সুভাষের সঙ্গে আমার স্বভাবের মিল ছিল না, তার স্বধর্ম আমার নয়। অবশ্য দু'জনেই জানতাম যে আমরা আলাদা ছাঁচে গড়া। সুভাষের জীবন আধ্যাত্মিক পথে চ'ল্‌বে না একথাটা যতই বুঝতে পারি, দুঃখ আমার ততই বাড়ে। তার অস্থিতে মজ্জাতে রয়েছে বিপুল কর্ম-চেতনা, জরুরী কাজের জন্যে সব সময়েই তৈরী যেন সে। সেও বুঝেছিল যে আমার পথ আর তার এক নয়। তবু আমরা বরাবরই ছিলাম পরস্পরের পরম বন্ধু। ভুল বোঝার মেঘ সে আকাশকে কোনোদিন আচ্ছন্ন করেনি কোনো মুহূর্তেই। আমাদের অন্তর্গূঢ় ভালোবাসা এসব বাহ্যিকতাকে ছাড়িয়ে গভীরে পৌঁছেছিল বই কি। হ্যাঁ সুভাষ ভালো ক'রেই জানত, সে যদি আমাকে তার পথে টান্‌বার জন্যে জোর করে তবে হয়ত আমি, তার কথা এড়াতে পারব না—তাকে মেনে নেবো। রাজনীতির পথ তার জীবনের পথ আর আমি পছন্দ করিনা সেটা— সুভাষের এ জন্যে দুঃখের অবধি ছিল না। কিন্তু জীবনে কখনো মুখ ফুটে সে খেদ করে নি এজন্য। কেবল একবার মাত্র, কোন্ অতর্কিত মুহূর্তে, বেদনার আতিশয্যে সে একটা কথা ব'লে ছিল। আমি আত্মীয় স্বজন, সংসারের সকল বন্ধন কেটে দিয়ে যৌগিক জীবন যাপনের জন্য শ্রীঅরবিন্দের আশ্রমে এসেছিলাম— ১৯২৮ সাল। সেই সময়ে সে আমার এই পলায়নী মনোবৃত্তির নিন্দা করেছিল। কিন্তু তাতে ক'রে সে এই বিপথচারীটিকে ভুলতে পারেনি, বরং তারপর থেকে সে

যেন আমায় বেশি ভালোবেসেছে। তাই আমি বলবই বলব যে, সুভাষ কখনো অপরের ওপর জুলুম করত না, ঝগড়া বিবাদ ত দূরের কথা। যারাই তার সঙ্গে থেকে কাজ করেছে, দাঁড়িয়েছে তার পাশে এসে—কয়েকটি দিনের জন্যও তার অন্তরের গভীর সহানুভূতির ছোঁয়া পেয়েছে, তারাই নিশ্চয় একথা স্বীকার করবে যে, সুভাষ কোনো দিনও প্রভুত্ব করতে চায় নি, শাসন করে নি, নিজস্ব মতবাদ জোর ক'রে কারো ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়নি, মানুষের ব্যক্তিত্বকে সে মর্য্যাদা দিত, প্রত্যেকেরই বিচারশক্তিকে সে স্বাধীনতা দিয়ে এসেছে। হুকুমের হাকিম হবার মত দুর্জয় মনোবৃত্তি তার কোনোদিনো ছিল না—নীতিতে তার বিশ্বাস ছিল এত উজ্জ্বল, হৃদয়ের প্রেমাধিকতা ছিল এত প্রবল, মনোজগতে দরদ ছিল এত খাঁটি যে আর সবাইকে হুকুম তামিল করিয়ে সে বড় হবে এ সে চাইতো, প্রকৃতই না। এ কথাও একটি প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত আমার ব্যক্তিগত জীবন থেকেই দিই না কেন ;

আগেই বলেছি, তার সঙ্গে আমার মতের গরমিল ছিল—দু'জনে সম্পূর্ণ আলাদা প্রকৃতির আমরা, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এ পার্থক্য বেড়েই গেছে। শিল্পকলা, কবিতা, সঙ্গীতের দিকে আমার অনুরাগ বেড়ে চলেছে যত, সুভাষের দেশ-প্রাণতাও তেমনি গভীর হয়ে উঠেছে দিনে দিনে ; ভারতের স্বাধীনতা তার কাছে হয়ে উঠেছে দিব্য সাধনার মতন একটা কিছু। কিন্তু ওদিকে আমার মনে আবার দেশপ্রেম সাড়া জাগায় না, বুঝতে পারি মন ঝুঁকছে আধ্যাত্মিক জীবনের দিকে, ঈশ্বরাভিমুখী হ'য়ে উঠছি আমি। রাজনীতির জটিলতা আমার ভালো লাগে না। আপাতত ওসব কথা থাক, যা বলছিলাম সেই ঘটনাতে ফিরে আসা যাক। ১৯২৩ কিম্বা ২৪ সাল, সি, আর, দাস সবে স্বরাজপার্টি গঠন করেছেন। অল্প দিনের মধ্যে স্বরাজপার্টি বেশ প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন ক'রে নিল। সারা বাঙলা মেতে উঠ্‌ল। সুভাষ তখন চিত্তরঞ্জনের উপযুক্ত সাকৃরেদ্। আমরা সবাই তাকে বলি চিত্তরঞ্জনের "দক্ষিণ হস্ত"। চিত্তরঞ্জন আমায় নির্ব্বাচন যুদ্ধে দাঁড়াবার জন্যে বল্‌লেন। প্রতিপক্ষ নদীয়ার মহারাজা। সে জন্যে ভাবিনি ততটা, যতটা ভেবেছিলাম এ পথে আমার আসা ঠিক হবে কি না।

চিত্তরঞ্জনের ত্যাগকে আমি শ্রদ্ধা করি, কিন্তু তাঁর—শুধু তাঁর কেন, বরাবরই রাজ-নীতিতে আমার অন্তর সাড়া দেয় না। কারণ যত দিন যায় আমার জীবনে বৈরাগ্য

আসে গভীর হ'য়ে। ভেবেচিন্তে শেষকালে সুভাষের কাছে গিয়ে বল্লাম আমার অসুবিধের কথা। তারপর বল্লাম,— "কিন্তু সুভাষ, তুমি যদি রাজনীতিতে নামতে বলো আমায়,—রাজি আছি। তার জন্যে যদি জেলে যেতে হয় ত যাবো। তোমার কথা রাখতে সব সময়ে আমি তৈরী। কিন্তু সত্যি কথা বল্‌তে কি, মনে প্রাণে আমি রাজনীতির পরিপন্থী। সেকালের যুগে রাজনীতির গৌরব ছিল হয় ত, কিন্তু আজ সভ্যতাকে পঙ্গু করে রেখেছে এই রাজনৈতিক দলাদলি।...এখন বলো আমায় কী করতে হবে।"

আমার দেশপ্রীতির অভাবে সুভাষ খুবই ব্যথিত হয়েছিল, তার চোখের পাতা ক্ষণেকের জন্য নত হয়েছিল। সে আয়ত দীপ্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইল। শেষে আমার পিঠের ওপর হাত রেখে বল্‌লে সে—"দিলীপ তুমি কি আমায় পাগল মনে কর না কি? আমি জানি এ পথ তোমার নয়। শুধু শুধু আমার জন্যে তোমার আদর্শ বিসর্জন দিতে বলব কেন? তুমি তোমার স্বধর্ম পথে চলো। দিলীপ আমি ঠিক অত ছোট রাজনীতিক নই। অন্যের মত আমি বলি না, ভারতের সবাই জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ ক'রে দেশের জন্যে আত্মনিয়োগ করুক—লড়াই করুক। তার চেয়ে যদি তুমি তোমার স্বভাবের গতিকে ঠিক পথে চালিয়ে নিয়ে গিয়ে আপনার লক্ষ্যে উপনীত হ'তে পার, তাতেই তোমার সার্থকতা, সেই তো তোমার সব চেয়ে বড় দেশের কাজ করা হ'ল। মনুষ্যত্বকে ফুটিয়ে তোলাই না মানুষের কাজ।"

তার একথা যেন আমার চোখে মানুষটিকে নূতন ক'রে তুলে ধর্‌ল। সত্যি তার নূতন পরিচয় পেলাম সেদিন। সুভাষ ত কই আমায় জোর ক'রে দলে ভিড়িয়ে নিল না। সে যদি সত্যিই প্রভুত্বের পক্ষপাতী হ'ত, সে যদি সবাইকে এক ছাঁচে ঢালতে চাইত তাহ'লে সেদিন আমায় অনায়াসে ছেড়ে দিতে পারত কি? এ থেকেই বোঝা যায় যে, সুভাষ কাউকে মতের বিরুদ্ধে জুলুম করতে চাইত না। ফ্যাসিষ্টবাদী সে ছিলনা মোটেই। যারা নিজেদের দলগত স্বার্থ খুঁজে বেড়ায় তারা ত স্বার্থ-সিদ্ধির খাতিরে অমন অনেক কথাই বলে,—সেসব অসার কথা যে কতদূর মিথ্যা তা যারা সুভাষকে ভালো ক'রে দেখেছে তারা জানে।

কিন্তু গোড়ায় যে কথাটা শুরু ক'রে অন্য কথায় এতদূর চলে এসেছি সেটা ত

এখনও শেষ হয়নি। তার্কিক যুদ্ধে নাম কেনার জন্যে যে নূতন উদ্যম দেখা গেল আমার মধ্যে সেটা কিন্তু দেখতে দেখতে গেল উবে। প্রথম দফায় তর্কের বিষয় স্থির হ'ল "দেশ রক্ষা"। বলাবাহুল্য যে বাছাবাছা আভিধানিক শব্দ সম্ভার সংগ্রহের দিকেই দৃষ্টি সবার। কিন্তু সে কথা যাক, সুভাষের তাবৎ চেষ্টা দিয়েও কিন্তু আমার স্বভাবসিদ্ধ নির্বাণোন্মুখ উৎসাহকে বাঁচিয়ে রাখা গেল না। সুভাষ হয়ত মনে মনে একটু মর্মাহত হয়েছিল, আমার এই আনাড়িপনা দেখে, হয় ত সেই সঙ্গে এটুকুও সে বুঝেছিল যে, কবি গাইয়েরা যেমন জন্মগত শক্তি নিয়ে পৃথিবীতে আসে তেমনি তার্কিকও তার স্বাভাবিক শক্তি নিয়েই জন্মায়। তাই বোধ হয় সুভাষ আমাকে বিরাট তর্কবীর করবার জন্যে খুব বেশি চেষ্টা করেনি। হয়ত সে তার নিজের ব্যক্তিত্বকে বেশি ফুটিয়ে তোলার কাজটা আরো দরকারী বুঝেছিল—সভায় দাঁড়িয়ে বিদেশী ঢং-এ, শান্ত, ধীর অথচ স্পষ্ট এবং সুন্দর ভঙ্গিতে, উজ্জ্বল বুদ্ধিদীপ্ত চোখে সে বক্তৃতা দেয়। তার অকাট্য যুক্তির বিপক্ষে দাঁড়িয়ে আমার প্রথম দিনের বক্তৃতার উৎস যেন শুকিয়ে গেল। সত্যি আমার দুরবস্থা দেখে সুভাষের করুণা হয়েছিল। সুভাষের মনটা ছিল বড় কোমল—যে করুণা মাতৃত্বে ফোটে সেই করুণা সেই দরদ দিয়ে বিধাতা ওর মনকে গড়েছিল। আমার অবস্থা দেখে ওর সেই মাতৃকল্প মন ভিজে গিয়েছিল। সত্যি আমার কি দোষ, ও যদি আমায় জোর করে না টানত তাহলে ত আর এমন কাণ্ড হত না—একথা মনে হয়েই যেন সুভাষ তার বন্ধুর প্রতি আরো নরম হ'য়ে পড়ল। শুধু সেদিন ব'লে নয়, তার এই মাতৃভাব ছিল তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, কোনোদিন এ সমবেদনার অভাব দেখিনি তার।

ওর স্বভাবের সঙ্গে জড়িয়েই ছিল এই সমবেদনা বোধের কোমলতা, দিন দিন বয়সের সঙ্গে এটাও বেড়েই যেতে দেখেছি। কি জানি এটা হয়ত দুর্বলের প্রতি শক্তিমানের অনুকম্পা। তার এই স্বভাবসুলভ কমনীয়তার সুযোগ নিয়ে অনেক আগাছা পরগাছা এসে তার জীবনকে বিড়ম্বিত করেছে কতবার। কত যে বর্ণচোরা বহুরূপী আর্তকণ্ঠে আশ্রয় ভিক্ষা করেছে এবং পেয়েছে। আর এই সব পরমবন্ধুদেরই কেউ কেউ গোয়েন্দাগিরি ক'রে পুলিশের কাছে সুভাষকে ধরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তাদের স্বরূপ জানবার পরও সুভাষ তাদের দুঃসময়ে সাহায্য না ক'রে পারেনি। আসলে সুভাষের এই ধরণের অনেকগুলি অপোগণ্ড পোষ্য ছিল, সুভাষ ছিল এদের

অন্নদাতা। তার মানে এ নয় যে, এরা ছাড়া আর কেউ তার সাহায্য পায়নি। যারা সত্যিকার যোগ্য ব্যক্তি তাদের দিকেও সুভাষের নজর ছিল ঠিকই। যে সব রাজবন্দী সত্যকার দেশসেবার কাজে জীবনের সব কিছু বিসর্জন দিয়েছেন, তাঁরা বড় একটা সুভাষের কাছে সাহায্য চাইতেন না, কারণ তার দরকার হত না। সুভাষ নিজে থেকেই তাঁদের দুঃস্থ পরিবারবর্গকে নানা ভাবে সাহায্য করত, সেদিকে তার খর দৃষ্টি থাকত সর্বদা। আমি নিজেও সুভাষের কথামত কয়েকবার গানের আয়োজন করেছি টাকা তোলবার জন্য। এতে সুভাষ অসম্ভব কৃতজ্ঞ হ'য়ে উঠত—যেন আমি তার ব্যক্তিগত কোনো উপকার করতে লেগে গেছি। তার সে কৃতজ্ঞতা দেখে আমার কৌতুক বোধ হ'ত। সত্যি এতে সুভাষের ব্যক্তিগত স্বার্থ কী থাকতে পারে!...একটা কারণ অবশ্য ছিল, সুভাষ জানত যে, আমি মনে প্রাণে রাজনীতির বেদরদী, তবু যে এসব ব্যাপারে সহায়ক হই সেটাও তার কাছে ব্যক্তিগত দরদ বলেই মনে হ'ত। কতদিন তাকে তামাসা ক'রে বলেছি, "তুমি যে কোনো দিন দেশের হর্তাকর্তা বিধাতা হতে পারবে এ আমার বিশ্বাস হয় না, তা সে তুমি যতই চেষ্টা কর না কেন। হ্যাঁ, আমি ঠিকই বলছি একদিক দিয়ে। অসাধুতায় তোমার তেমন হাতযশ নেই, ফলে কোনোদিন ওপথে তোমার উন্নতির আশা দেখি না। কারণ তুমি মিথ্যে কথা যদি একটা বলো ত সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়ে যাবে, সবাই চিনে ফেল্‌বে। এ ধরণের আনাড়ি লোকের কাজ নয় রাজনীতি করা, বা ধাপ্পাবাজি করা বা দেশনেতা হওয়া।"

কয়েক বছর পরে আমার এ কথাটা সুভাষ আবার আমাকেই শুনিয়েছিল। জেলে যাবার আগে। সে জানত যে আবার সে বন্দী হবে। সে দিনটির কথা আমার বেশ মনে আছে। আশ্রম থেকে কলকাতায় এসেছি। আমার কৃতী ছাত্রী উমা বসুকে গান শেখানো নিয়ে আমি ব্যস্ত। মোটর গাড়িতে বসে আমি আর সুভাষ পাশাপাশি, সে আমার হাঁটুর ওপরে হাত রেখেছে। আশ্রমে ফেরবার আগে সুভাষের জন্যে বারাকপুরে একটি সম্বর্দ্ধনা উৎসবের আয়োজন হয়েছে, গান শোনাবো আমি।

"দিলীপ" বল্‌লে সুভাষ, কণ্ঠে তার আকুলতা—"তুমি এত তাড়াতাড়ি তোমার নিরালা আশ্রমে চলে যেয়ো না। তোমাকে আমার বড় দরকার!"

"কিন্তু তুমি কিছুতেই মন থেকে এ কথা বলছ না, সুভাষ।" আমি অবাক হ'য়ে বলি, "তুমি হ'চ্ছ কাজের মানুষ, দেশসেবার কাজে তুমি ডুবে আছ। আর তোমার মতে, আমি জেগে জেগে স্বপ্ন দেখি। আর কলকাতাতে এলেও তোমাতে আমাতে দেখা হয় দৈবাৎ।"

"নাই হোক গে।" সে আমার পানে উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে বলে—"আমার জীবনের কিছুই জাননা ত। দিনরাত আমায় মেলামেশা করতে হয় যাদের সঙ্গে তারা সবাই ধূর্ত্ত, চতুর, চক্রান্তকারী। তুমি যদি থাকতে কলকাতা তাহলে এটুকু সান্ত্বনা ত পেতাম যে, এমন একজন রয়েছে যার কাছে আমার মনের কথা কইতে পারি। অন্তত ইচ্ছে করলে একজন ভালো লোকের পাবো দেখা।"

সুভাষের জীবনের দুঃখবেদনার দিকটুকু যাদের অগোচর তারা আমার এ কথার গভীরতা জানতে পারবে না ঠিকই। সে যে কোনোদিনই নিজেকে ঘিরে মহিমা গৌরবের জলসা বসাতে চায় নি, না চেয়েছে ঘটনাপরিস্থিতি উদ্ভূত নিজের পরিনতিকে লালন করতে। সাধারণ রাজনীতি বিশারদের মত তার কাছে আদর্শবাদ কেবল মাত্র ফাঁকা আওয়াজ আর অসার বুদ্বুদ বলে মনে হয়নি, দুঃখবাদের দীর্ঘনিশ্বাস দিয়ে জীবনকে দেখেই সে খুশি হয়নি। সুবিধাবাদের দিকে তার এতটুকুও নজর ছিল না, বানিয়ে বলার মত কথা ঝাঁকে ঝাঁক তার ঠোঁটের ডগায় জোগাতো না স্তাবকতার শ্লোক।

তাই পরবর্ত্তী কালে নিজের অনিচ্ছাসত্বেও স্তাবকতার চেষ্টা করে অপটুতার জন্যে ধরা পড়ে বেচারীর সে কি দুরবস্থা! আসলে সুভাষ কখনও মিথ্যাচার করতে পারত না। সে যে ছিল সহজ, দৃপ্ত, দৃঢ় পৌরুষে ভরা, সে যখন বর্ম্মাতে বলেছিল —"কখনও কোন অবস্থাতেই আমি পরাজয়কে মান্‌তে পারি না।" তখন তার কথায় বিন্দু মাত্র বড়াই ছিল না। এবং সেই কারণেই, কংগ্রেস থেকে তাকে তিন বছরের জন্য সরিয়ে দেওয়াতে যখন তার বন্ধু অনুচর সবাই হতাশ হয়ে 'সব গেল, সব গেল' বলে মুষড়ে পড়েছিল তখন এদের আত্মপ্রত্যয়ের অভাব দেখে সুভাষ বুঝতে পেরেছিল তার কেউ নেই আপনার, সে একাকী! হয়ত একটু চেষ্টা করলেই সে মানিয়ে বনিয়ে নিতে পারত, নিজের হারানো প্রতিষ্ঠা ফিরে পেত, তাতে ক'রে সত্যিকার কূটনীতিকের পরিচয় দিতেও পারত সে। কিন্তু সে যে

কোনোদিনই চাতুরীর ছোঁয়াচটুকু সইতে পারত না, পারত না মিথ্যাকে বরদাস্ত করতে—তাই বড় রকমের তথাকথিত দেশনেতা হবার যোগ্যতা তার ছিল না। বড় রকমের নামজাদা দেশত্রাতা নেতা হতে গেলে চাই বড়াই, জাঁকজমক যাকে বলে ঠাট। আর সেই সঙ্গে চাই গণ্ডারের চামড়ার মত শক্ত সহনশীলতা—সুখদুঃখ মানঅপমানের স্পর্শকে যেন পরোয়া করলে চলবে না। কিন্তু সেদিক দিয়ে সুভাষ ছিল একটু লাজুক—বরং এলোমেলোই বলা যেতে পারে। হয়ত তার বর্ম্মা অভিযানের উজ্জ্বল ঐতিহাসিক ঘটনার পর আজ একথাটা খাপছাড়া শোনাবে। ভারত অভিজান তাকে ঐতিহাসিক মর্য্যাদার চেয়েও হয়ত বড় কিছু প্রতিষ্ঠা এনে দিয়েছে, সমস্ত দেশের কাছে সে বিস্ময়, পৃথিবীর চোখে তার অভিযান আরও অদ্ভুত। যেন গল্প কথা। কিন্তু তবু আমি বলব, যে, সুভাষ কখনও ঢাক পিটিয়ে রাজনীতিতে কল্কে পায়নি, সে যে দলাদলির লড়াইতে পাত্তা পেত না তার কারণও ওই। আর পাঁচজন দিগ্‌গজ রাজনীতিকের মত সে বেমালুম ধোঁকাদুরস্ত ছিল না। কিন্তু কূটনীতি আর রাজনীতি শাস্ত্রে ধোঁকাবাজীর মূল্য অনেকখানি। এ পথে চল্‌তে গেলে জান্‌তে হবে নিছক মিথ্যার সঙ্গে কতটুক সত্যের ছিটেফোঁটা মিশেল দিয়ে চালাতে হবে, প্রতিপক্ষকে নিখুঁত ভাবে ধাপ্পা দিতেও হবে। নিয়মই এই, আর যারা তারা সব ভুল করছে, তাদের মধ্যে অনেক গলদ, শুধু আমার দলটি ভালো, আমার দলের মত আত্মত্যাগী পৃথিবীতে আর নেই, আমার কোনো ভুল হয় না, আমি কারুর কোনো ক্ষতি করতে চাইনে তবু আর পাঁচজনে আমার অনিষ্ট করবার জন্য অন্যায় করে বেড়াচ্ছে, ভুল করছে ওরা অজস্র এবং আমি এদের দুষ্কার্য্যের প্রমাণ পেয়ে মনে মনে যে কতই আঘাত পেয়েছি কী বলব! আমার ভুল? ক্ষেপেছ! এই ভাবটি সদাই দেখাতে পারা চাই, তবেই ত সত্যকার নেতা।

আমার বলতে কষ্ট হয় তবু বলব, যে সুভাষ শেষ পর্য্যন্ত তার সত্যপ্রীতিকে অম্লান রাখতে পারেনি। অবশ্য এর জন্যে তাকে দোষ দেওয়া যায় না। কারণ বর্ত্তমানে প্রত্যক্ষ রাজনীতির কর্ম্মক্ষেত্রে সত্যের একনিষ্ঠতা আঁকড়ে ধরে বেশিদিন থাকার উপায় নেই। কেবল যে আত্মার কল্যাণের খাতিরেই মিথ্যার আশ্রয় নিতে হবে তা নয়, বিপদে সর্বনাশের হাত থেকে বাঁচবার জন্যেও অভিযানী হতেই হবে।

সত্যি সুভাষের জীবনের এই আপসোসের দিকটা দেখিয়ে না দিলে আমার ত্রুটি

হত বইকি! মানে সে যে বলেছিল, এমন একজন বন্ধু তার বড় দরকার যার কাছে সব কিছু বলা যায়, যে নাকি তার কাছে সান্ত্বনার মত হয়ে থাকবে ভিড়ের বাইরে,—রাজনীতি যাকে স্পর্শ করেনি।

সে যখন ১৯২৯ সালে ইউরোপ থেকে ফিরল তখন ত দেখেছি তার সে কী আশা, কী স্বপ্ন দেশের জন্য, সত্যের জন্য জীবন উৎসর্গ করবে সে! তখন তার অনুতে রেণুতে এই বিশ্বাসের অনুরণনই ছিল—দেশ আর সত্য আলাদা নয়, একই ব্রহ্মের বিভিন্ন দিক মাত্র। তার সেইকালের আন্তর্জাতিক রাজনীতির দৃষ্টিভঙ্গিই দেশের ধমনীতে সে প্রবাহিত করে উন্নত করে এ দেশকে। কিন্তু তা ক্রমশঃ ঝাপসা হয়ে যেতে লাগল। অবশ্য এ ছাড়া অন্য কিছু আশা করাও ভুল। যে আদর্শের অনুপ্রেরণায় সে নিজেকে উৎসর্গ করেছিল দেশের কাজে সেই আদর্শবাদের মূলে যে বিবেকবুদ্ধির তাগিদ ছিল সেটা অধীরতার প্রসূত বইকি। তার কেবলই মনে হত সংকল্পে সিদ্ধিলাভ আজই এই মুহূর্তে করা চাই। কিন্তু এত ব্যস্ত হবার কাজ নয়, সময় লাগে।

সেবার অসুখের পর, যে অসুখের জন্যে তাকে ভিয়েনা যেতে হয়েছিল, সে প্রায় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলত—"স্বাধানতা হাতে হাতেই ত মেলে না!" ভিয়েনাতে তাকে যেতে হয় অস্ত্রোপচারের জন্য। সেখানে গিয়েও সে অমনি বিষন্ন হয়েই থাকত, ফিরে এসেও একথা বলেছিল সুভাষ।

সেবার এক সন্ধ্যায় এল্‌গিন রোডের বাড়িতে আমাদের যে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা হয়েছিল তা আমার চিরদিন থাকবে মনে। অবশ্য আমার স্মৃতিশক্তির ওপর আবার জুলুম করতে হবে এ জন্যে। তা হোক, সুভাষের মনের বেদনা ত বুঝতে আমার ভুল হয়নি—তবু যদি অজ্ঞাতে কোনো ভুল হয়ে যায় এই আশঙ্কায় আমি সেদিনের কথা কটা না বলে চুপ করে থাকতে রাজী নই।

পাঁচ

মরা বসে ছিলাম বারান্দায়। সবে সূর্য্যের শেষ রশ্মির রক্তিম আভা মুছে গিয়ে কাশের কোলে একটি একটি তারা এখানে ওখানে ফুটে উঠ্‌ছে। অনন্ত নীলি-র বুকে পাপড়িগুলি যেন দল মেলে জেগে উঠ্‌ছে আপনি কনকবর্ণে।

হঠাৎ স্তব্ধতা কাটিয়ে সুভাষ বল্‌ল—"দিলীপ! এক এক সময়ে আমার এত একলা মনে হয় নিজেকে!...সে যে কী অসম্ভব একাকীত্ব তুমি বুঝবে না।"

তার একটা হাত মুঠোর মধ্যে নিয়ে আমি বলি "সুভাষ! তোমায় একটা কথা বল্‌ব শুন্‌বে?"

জবাবে সে আমার পানে চেয়ে একটু হাসে—বিষন্ন সে হাসি।

"তোমায় উপদেশ দেবো এ কল্পনাও করিনি!" বলি আমি, "বরং এতদিন তোমার কাছ থেকে কিছু জানব, শিখব এই রকমেই অভ্যস্ত হয়েছি। কিন্তু আমার মনে হয় তোমার এ বেদনা, এই একলা একলা মনে হওয়া এ ত মানুষের রক্তেমাংসে মেশানো রয়েছে—মানে কি জানো, মানুষের এই দেউলিয়া ভাবটাকে ছাড়িয়ে সেই মানবতাকে সেই পরাশক্তির দিকে উন্মুখ করতে না পারলে এই অভাববোধের অবসান নেই, এই আমার ধারণা।"

একটু চুপ করে থেকে সে বল্‌লে—"তুমি বলছ যা তা জানি। জানি তার কারণ এককালে সে জিজ্ঞাসা আমারও হয়েছিল, হ্যাঁ!" তারপর যেন খুব স্বগত ভাবেই সে বলে—"আমিও এককালে চেয়েছিলাম সর্বদর্শী ঈশ্বরের কাছে দুর্গত মানবতার সহায় হবার প্রার্থনা জানাতে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত থাকতে পারিনি। যাদের ছেড়ে যেতে চেয়েছিলাম তাদের আর্ত্তবেদনা আমায় অস্থির করে তুল্‌ল। ভারতমাতার দুর্দ্দশা দেখে স্থির থাকতে পারি সাধ্য কি!"

তার এ কথার মধ্যে দেশকে দেবতার মত দেখার একটা ছবি ফুটে ওঠে। সাধারণ দেশপ্রেমিকের কণ্ঠে এ আকুলতা বাজেনা। আমি মুগ্ধ হ'লাম।

সুভাষ বলে আপন মনে—"তোমায় কতবার বলেছি যে, প্রায়ই আমার ইচ্ছে করে সব ছেড়ে দিয়ে ছুটে পালিয়ে যাই—এই জনকোলাহলের মধ্য থেকে দূরে। আমারও মাঝে মাঝে আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা ঘটেছে, হয়ত ঠিক তোমার মত ওইরকমের চিরস্থায়ী কিছু নয়।...কিন্তু তাহলেও...।" সে আরও গভীরভাবে বলে—"আমার এই কথাতে অবাক লাগে যে সত্যিসত্যি যদি আধ্যাত্মিক সিদ্ধি দিয়ে মানুষের চিরন্তন পরিবর্ত্তন সম্ভব হয় তাহলে অনেক সাধু সন্ন্যাসী যোগীরই ত আবির্ভাব তিরোধান হ'ল কিন্তু জনসাধারণের তাতে কতটুকু কি হয়েছে বলো!...তাই আমি ফিরে এলাম। কারণ আমার মনে ঘোর সংশয় জাগল, যাওয়া কি আমার উচিত হবে?...দুর্গতকে

সাহায্য করবার জন্যে আমার হাত বাড়িয়ে দেবো না ? তাদের কথা কানে তুলব না ?—তাদের যে বড় দরকার !”

“কিন্তু তুমি কি পারো সত্যি কিছু করতে, যদি তোমার নিজেরই···আমি যা বল্‌তে চাই বুঝেছো নিশ্চয় ?”

“মুক্তির কথা বল্‌ছ তুমি ?” একটু হেসে সে আমায় যেন বুঝিয়ে দেয় যে বুঝতে পেরেছে সে—“ভাগবতে নারদ যে বলেছিলেন যে নিজেই সাপের বাঁধনে রয়েছে বাঁধা, সে পারেনা অপরকে মুক্ত করতে, নিজেকে উদ্ধার না ক'রে ! এই কথা ! তোমার এ উপমার তাৎপর্য্য স্বীকার করি। আমাদের সামনে যেটুকু গোচর সেইটুকুর দিকে চেয়েই যাই না এগিয়ে···তার ওপারে যে অনন্ত তমিস্রা রয়েছে তাও মেনে নিচ্ছি। কিন্তু তাই বলে কি চুপ ক'রে বসে থাকা যায়, দিলীপ, তুমিই বলো। কর্ম্মের দৃঢ় সর্পবন্ধনকে যখন ছাড়ানো যাবে না তখন সেটাকে গলায় জড়িয়ে রেখেই যতটা পারি করি না কেন···নাই বা পারলাম পুরোটুকু করতে, ভাগ্য যখন আমার হাতের মুঠোতে নেইক তখন আমার সাধ্য মত করাই ত করা। কিন্তু ঠিক যুক্তিতর্কে এর মীমাংসা হবার নয়। বিধাতার নির্দেশ রয়েছে প্রত্যেক ঘটনার পশ্চাতে নেপোলিয়ন বল্‌তেন। মানুষের হিসেবের খাতিরে ঘটনা ঘটেনা, এটা মানতেই হবে। তাই আমি নিয়েছি পলিটিক্সের পথ, কাজের পথ। চাইলেই কি পারতাম অন্য কিছু করতে ?”

—“সে কথার মীমাংসা তুমিই ভালো পারবে করতে” আমি বলি—“তোমায় উপদেশ দেওয়া আমার কাজ নয়। বড় জোর এর আগে যে সব কথা বলেছি সেগুলোই আর একবার শোনাতে পারি আমি—যে, পলিটিক্স তোমার স্বধর্ম্ম নয়। তুমি এত ভদ্র, এত সুরুচি তোমার স্বভাবে। তোমার আশপাশের আর সকলে যা আছে তারা তাই থাকে, তবু তোমার এমন একা একা মনে হয় যদি নিজেকে অবাক হবার কিছু নেই তাতে।”

—“হয়ত তুমি সেদিক দিয়ে ঠিকই বল্‌ছ দিলীপ” বল্‌লে সুভাষ—“কিন্তু তুমি ত জানো যে আমি পালিয়ে গিয়ে শান্তি পাবার কথা ভাবতে পারি না। পলায়নীপন্থা, কোনো দিনই আমি মানতে পারিনি।”

“ও কথাটা তোমার খুব মধুর শোনালোনা সুভাষ !” আমি হাসতে হাসতে বলি,

"অবিশ্যি আমার সে কথা বলা সাজে না কারণ আমি যা বলি সেটা তোমার কাছে আরও বেশি রূঢ় লাগে। যাক ও নিয়ে আমি আর ত কোনো বাদপ্রতিবাদ করতে চাইনে—দর্শনতত্ত্ব আলোচনা আমরা নাই করলাম। কিন্তু তুমি যে একাকীত্বের কথা বল্‌ছিলে, বর্ত্তমান পরিবেশে তার হাত থেকে নিস্তার নেই তোমার।"

"আমি অবাক হয়ে যাই।" বলে সুভাষ চুপ করে যায়, যেন মনের কথা সবটুকু প্রকাশ করতে পারে না। শেষে বল্‌লে—"কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে, যে, এদেশে অনেক আত্মত্যাগী কর্ম্মীর দরকার। নিজেকেই যদি স্বার্থপরতায় আগলে রাখি তবে কি ক'রে তাদের দেখা পাবো, কি ক'রে গড়ব সেই আত্মাবিলোপী দল?"

—"কথাই তাই।" আমি একচোট হেসে নিয়ে বল্‌লাম—"আত্মত্যাগের রামরাজ্য কি তোমার ওই স্বার্থসর্বস্ব আমলাতন্ত্র দিয়ে আনতে পারবে তুমি—যারা কেবল বড় বড় শ্লোগান হাঁকুড়ে গোলামী করে বেড়ায় তারা হবে তোমার ত্যাগী! এখন বলো তাহলে তোমার এ ধাঁধার জবাব কি!"

আমার কথাটা এড়িয়ে সে কেবল সমস্যার গুরুত্ব সম্বন্ধে অনেক কথা বলতে লাগল।

—"কিন্তু সবচেয়ে বড় বিপদ কি জানো দিলীপ, সেটা আত্মাকে নিয়ে নয়। হয়ত শেষ পর্য্যন্ত বিশ্লেষণ ক'রে দেখলে জানা যাবে যে, মানুষের স্বভাবের সঙ্গে আত্মবোধ এত ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত যে সেটাকে বাদ দিয়ে চলা যায় না। সবচেয়ে বড় কথা কি জানো, যদি তোমার মধ্যে ভালোবাসার বীজ না থাকে তা হ'লে কিছুতেই তোমার দেশাত্মবোধ জাগবে না, কেউ তা গজিয়ে দিতে পারবে না হাজার চেষ্টা করলেও।" আবার একটু চুপ করে থেকে সে বল্‌লে—"কত তরুণকে দেখেছি ছুটে এসেছে, দেশের জন্যে সব কিছু বিসর্জন দেবার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় তারা দেশ উদ্ধার করবার জন্যে। দেখে মনে হয়েছে এরা আগুনের শিখার মত সত্য! কিন্তু তাদের এ অগ্নি ততদিনিই থাকে যতদিন পর্য্যন্ত একটা ভালরকমে ব্যবস্থা না হয়। কাজ গুছিয়ে তারা আস্তে আস্তে স্বার্থের কেন্দ্রে দুর্গ রচনা করে—তারা তখন নিজের পারিবারিক, আর্থিক সব ব্যবস্থা নিয়ে উঠে প'ড়ে লাগে—যত পায় তত চায়, আরও আরও চায়। যদি তুমি অহরহ এই সব মনের চেহারাই দেখ কেবল, তাহলে কি তোমার মনে হবে না যে, দেশের কাজ বলে যা কিছু

করা হচ্ছে সেগুলোর আড়ালে রয়েছে মানুষের স্বার্থ-লোলুপ সুবিধাবাদী চেহারা। মুখোস খুল্‌লে দেখবে সুবিধাবাদী, নিরাপত্তাপ্রয়াসী গৃধ্নু মানুষ!"

সত্যি তার প্রতি সহানুভূতিতে আমার মন যেন ভারী হয়ে ওঠে। আমি শুধালেম —"সত্যি, এত বিশ্রী?"

"হয়ত তার চেয়ে আরও বেশি বিশ্রী। জানো, এমন কত লোক দেখেছি যাদের এদিকে থাকলেও বিশেষ বঞ্চিত হবার আশঙ্কা নেই এতটুকু, অথচ তাদের যোগ্যতা আছে, তারাও ক্রমশঃ গড্ডলিকাপ্রবাহে গা ভাসিয়ে দিয়ে অকেজো হয়ে পড়ে। সবাই সেই বাঁধা পথে, যে পথ মাড়িয়ে আগে আগে গেছে আর সবাই সেই পথটা আঁকড়ে চলে, তাদের কাছে আর সবই তুচ্ছ! তার ফলে কি হয় জানো?"

"সর্ব্বনাশ হয়?"

ঘাড় নেড়ে সে জানায়—"সত্যি ত আর এদের নিয়ে দেশের স্বাধীনতার অভিযানে সফল হতে পার না—এরা ভীতু, এরা ধ্রুবকে ছেড়ে অধ্রুবের দিকে এগোবার নামে আড়ষ্ট হয়ে ওঠে। এরা শুধু পেটোয়া হয়ে থাকতে পারলেই নিশ্চিন্ত। নিরাপদে মোটা মাইনের চাকরী ক'রে কোনোরকমে মোলায়েম ভাবে জীবনটা কাটিয়ে দেওয়াই এদের কাম্য। তাই এসব দেখে শুনে আমার নিজেকে বড় অসহায় মনে হয়।" বলে সুভাষ দুঃখের হাসি হাসলে।

আমি চুপ করেই থাকি। ওদিকে রাত হয়ে যায়।

"তরুণ যুবক যারা আসে দেশ উদ্ধারের আদর্শ নিয়ে, প্রথম যৌবনের প্রদীপ্ত তাদের সে উৎসাহের মধ্যে যে কোনো কপটতা থাকে তা আমি বল্‌ছি না। সত্যি তারা অগ্নিশিখার মতই সহজ প্রবণতা নিয়ে দেখা দেয়। দেশকে তারা জাগাবে, তারা আনবে দেশের গৌরব ফিরিয়ে—অনেক আশা, অনেক স্বপ্ন। এ স্বপ্নে তারা আস্থাবান সত্যিই থাকে। কিন্তু দেখতে দেখতে সে উৎসাহ উদ্দীপনা ম্লান হয়ে আসে, আগুন যায় নিভে। শুধু পড়ে থাকে অঙ্গার, তারা হয়ে ওঠে নিরাপত্তার অনুসন্ধানী, তারা রূপ বদলে ফেলে, কেবল কাজ চালিয়ে যায় নিজেকে বাঁচিয়ে। যেমন বলি, তোমার মনে হয়, যদি আমার তেমন ক্ষমতা না থাকে তাহলে কেনই বা দেশের জন্যে এক পয়সা খরচ করব, তাহলে বল্‌ব তোমাকে দিয়ে দেশের কাজ হবে না। এই মনোবৃত্তি নিয়ে তুমি দেশসেবা করবে! বিশেষ ক'রে আমাদের এই

বিপুল বিরাট দেশ যেখানে সহস্র সমস্যার বেড়াজাল জড়িয়ে রয়েছে সেখানে ত মূল্য হিসেব করে সেবার সংকল্প চলে না। শুধু এক মনে সেবাই ব্রত করতে হবে। কিন্তু আমাদের দেশের যুবকেরা চট্ করেই ঘাগী হয়ে ওঠে, তারা চাতুরীতে অতি সহজেই রপ্ত হয়ে নেয়। সেই যে কাজ গুছিয়ে গহ্বরের কঠিন আবরণে তারা আত্মগোপন করে সেখান থেকে এতটুকু সরায় সাধ্য কার? তারা জানে কেবল, 'সব আগে নিজেকে বাঁচিয়ে চলো'।"

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মোহমুক্তি ঘটেছিল সুভাষের, এ সেই খেদোক্তির একটি দিক। কিন্তু এছাড়াও তার জীবনে বিষাদের অনেক করাল স্পর্শ এসেছিল। এক একটা বাঁকের মুখে এসে সে যেন ধাক্কা খেয়ে ছিট্‌কে পড়েছে বার বার। তাই তার মত আশাবাদীর সিংহ বিক্রমও একদিন ভেঙে পড়বার দাখিল হয়েছিল। সেই সেবারে ত্রিপুরীতে যেখানে সিংহের মত গর্জ্জন করা তার স্বাভাবিক হ'ত সেখানে তার বদলে সে মহাত্মাজীর কাছে করুণ কণ্ঠে জানালে আবেদন! এ আবেদনে সে বড়ই ক্ষীণ অজাপ্রকৃতির পরিচয় দিয়েছিল বোধ হয়। কিন্তু আমি যেন পলিটিক্সের মধ্যে ঢুকে পড়েছি। তার চেয়ে বরং সুভাষের যৌবনের কথা কিছু বলি—যখন তার মানবতার ক্রমবিকাশ দিকে দিকে দেখা দিচ্ছে, যা থেকে দলগত রাজনীতির স্পর্শ ছিল বহু দুরে, অগোচরে সেই সব কথা!

ছয়

এরপরের প্রসঙ্গ, যা আমার খুব স্পষ্ট মনে আছে আজও—সে হচ্ছে প্রেসিডেন্সী কলেজের এক ইংরাজ অধ্যাপককে প্রহার করার কাহিনী। অধ্যাপকটির নাম করতে চাই না, এখানে দরকারও নেই।

এ ঘটনাটা অনেকেরই জানা আছে।

ইংরাজ অধ্যাপকটি একজন ভারতীয় ছাত্রকে যৎপরোনাস্তি অপমান করেছিলেন এবং বার বার অনুরোধ করার পরেও তিনি এর জন্য মাপ চাইতে রাজী হননি কিছুতেই। অপমানিত ছাত্রসমাজের জন্য কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ কিছুই করেন না। তাঁরা যেন ব্যাপারটা গায়েই মাখতে চান না। আমাদের সবারই কিন্তু মেজাজ গরম হয়ে ওঠে,—যখন তখন সাংঘাতিক একটা কিছু করা বিচিত্র নয়। সুভাষের বিষন্ন

গম্ভীর মুখের দিকে চেয়ে অনুমান করি আসন্ন একটা কিছু। এক এক সময়ে রাগে তার মুখ রক্তবর্ণ হয়ে ওঠে যখন কলেজের কর্ত্তৃপক্ষের কাছে সে প্রতিহত হয়ে ফেরে। তাঁরা ব্যাপারটা স্রেফ উড়িয়ে দিলেন।

তারপর এলো সেই আসন্ন ঝড়। এ আসবে জানা ছিল।

সুভাষ আমায় এ সম্বন্ধে কোনো কথাই বলেনি, কারণ সে চাইত না তার জন্যে আমি কোনো বিপদে পড়ি। এ তার স্বভাব। যে ক'টি ছেলেকে নইলে নয় মাত্র সেই ক'জনকেই ডেকে নিয়ে সেই অধ্যাপকটিকে বেশ উত্তম মধ্যম দিয়েছিল। একদিন সকালে খবরের কাগজে পড়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম সেই বদমেজাজী অধ্যাপকটিকে কি ভাবে বাঁচাবার জন্যে কসরৎ করা হয়েছে। বলা বাহুল্য সবাই বুঝতে পেরেছিল এই প্রহার পর্ব্বের মূলে সুভাষ রয়েছে। অবিশ্যি আমি নিজে হয়ত পছন্দ করিনি, আগে থেকে সাবধান ক'রে না দিয়েই একটা লোককে মারধর করাটা। তাই সুভাষকে এর জন্যে বাহবা দিতে যেন একটু বাধল্! কিন্তু প্রশংসা না করে পারিনি এইজন্য যে সে নিজের সঙ্গে আর কাউকে জড়ায়নি। দলপতির সমস্ত অপরাধের দায়িত্ব স্বীকার করে নিয়েছিল সুভাষ—যদিও তার বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ প্রয়োগ কেউ খুঁজে পায়নি। তবে এটা সবাই জানত এ তার কাজ।

তার পরও সুভাষ বেকসুর খালাস পেতো, যদি প্রকাশ্য সভায় স্বীকার করত যে মারধর করাটা অন্যায়—এইটাই কর্ত্তৃপক্ষ চেয়েছিল। কিন্তু সুভাষের ঘৃণাটা ছিল আন্তরিক, তাই সে এ কথাটা বল্‌লে না কিছুতেই। বরং বল্‌লে যে, এই বিদেশী ছাত্রদের সাজা দিয়ে যে ভাবে উত্তেজিত করেছিল তার ফলেই না তারা একাজ করতে বাধ্য হয়েছে। তার এই সাংঘাতিক অকপট স্বীকারোক্তির ফলে কলকাতার বিশ্ববিদ্যালয় তাকে তাড়িয়ে দিলে। সুভাষ একবার জবাবে হেসেছিল, সে হাসি তিক্ত! সঙ্গে সঙ্গে সুভাষের কীর্ত্তি কাহিনী মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল—সে হয়ে উঠল হিরো। এরপর থেকে সে যেন পুলিশের লক্ষ্য হয়ে রইল।

প্রহার পর্ব্বটা সমর্থন করতে পারিনি ঠিকই তবে কিন্তু সুভাষ এতটুকু বিচলিত হ'ল না শান্তভাবে বুকপেতে যে শাস্তি নিজের ঘাড়ে তুলে নিল সে এটার প্রশংসা না করে পারি না।

এরপর থেকে সুভাষ বড় একটা কলেজে আসত না, সে নাকি কলেজের কলঙ্ক

অতএব সে আর আসে না। এই সময়ে তার নিঃসঙ্গতার কথা ভেবে আমার কষ্ট হ'ত কিন্তু তখন গান নিয়ে এতই মেতে ছিলাম যে তাকে গিয়ে দেখে আসার আর ফুরসৎ হ'য়ে উঠত না। এদিকে সেও আমার ওখানে যাতায়াত বন্ধ করে দিয়েছিল —এইসব কারণেই।

একেবারে দর্শনশাস্ত্রে অনার্সে ফার্ষ্ট-ক্লাস নিয়ে বি-এ পাশ করার পর সে আবার এলো আমার কাছে—তার আগে নয়। আশা করিনি। আই-সি-এর পরীক্ষা দেব, লণ্ডনের ব্যারিষ্টার হবো সেই সঙ্গে অঙ্কশাস্ত্রে ট্রাইপোজটাও দিয়ে দেবো মনে মনে এইসব ভেঁজে রেখেছি—বিলেত যাওয়ার সব ঠিক হয়ে গেছে। এমন সময়ে সুভাষ এসে বল্লে সে খুব সম্ভব আই-সি-এস্ দিতে যাবে, কেম্ব্রিজের কলেজে তার জন্যে সম্ভব হলে একটা সীট আমি যেন ব্যবস্থা করি।

আমি যেন কথাটা শুনেও বিশ্বাস করতে পারি না নিজের কানকে।

—"তুমি, সুভাষ! তুমি আই-সি-এস দিতে চাও?"

তার জাবাবে সুভাষ মৃদু হাসে।

•

বছর খানেক পরে কেম্ব্রিজে যখন আমরা একসঙ্গে থাকি সেই সময়ে সুভাষ একদিন আমায় এবং আরও কয়েকজন ছেলেকে ডেকে গোপনে জানালে যে, আই-সি এস সে দিচ্ছে নইলে তার বাবা তাকে বিলেতে পাঠাতে রাজী হতেন না। তাই সে মনে মনে সংকল্প করেছে যে যদিই বা পরীক্ষায় সে পাশ করে তাহলে চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে দেবে নিজে থেকেই।

তার পরীক্ষা পাশ সম্বন্ধে কারুর তেমন সংশয় ছিল না। আমরা শুধু অধীর আগ্রহে উৎসুক হয়ে সেই দিনটির দিকে চেয়ে আছি যে দিন বহুজনাকাঙ্খিত সিভিল সার্ভিসটা সুভাষ অতি সহজেই প্রত্যাখান করবে। তার এই প্রত্যাখ্যানের দিকে আমরা যে উন্মুখ হয়ে চেয়ে ছিলাম—তার পিছুতে কেবল কৌতুহলই ছিল তা নয়, এই অভাবনীয় আগামী ইতিহাসের দিকে মোহ এবং আকর্ষণটা বড কম নয়—সেটাকে রোমান্সের পর্য্যায়েও ফেলা যেতে পারে

কিন্তু রোমান্স তার মূল্য আদায় করে নেবেই। মোদ্দা এই সব সাতপাঁচ মিলিয়ে মাঝখান থেকে আমার লক্ষ্য গেল এলোমেলো হয়ে, যে আশাস্বপ্নের

জাহাজে সমুদ্র পাড়ি দিয়েছিলাম সেটা সুভাষের এই আশ্চর্য্য কাণ্ডকারখানা দেখে-শুনে থম্‌কে গেল—আমার রাতে ঘুম নেই। সত্যি ত এ অবস্থায় কি আমি আই-সি-এস হবার জন্মে তোড়জোর করতে পারি! না আছে কৈফিয়তের ঝামেলা—এমন কোনো গুরুজন নেই মাথার ওপরে যার ভয়ে আমায় খেয়ে না খেয়ে পরীক্ষা দিতেই হবে। আমি হচ্ছি ভারতের স্বাধীন যুবক, কারো পরোয়া করি না। যা খুশি আকাশকুসুম কল্পনা করি-না কেন তামায় ঠেকাবে কে? আর যদিই সেই স্বপ্নের ব্যর্থতায় আমার জীবনের ফুল বিছানো পথ কাঁটা আর আগাছায় যায় ভরে তবু ভাবি না, রয়েছে কিছু বিত্ত। তা ছাড়া আমিই যে সুভাষকে এ কলেজে ভর্ত্তি করিয়েছি তার জন্যেও গর্ব্বে আমি যেন পেখম ফলিয়ে বেড়াই। কিন্তু সিংহকে আশ্রয় দেওয়ার অসুবিধেও রয়েছে ঢের।

আমার গানটান গাইতেও যেন কেমন বাধ বাধ লাগে। ঠিক পাশের ঘরেই একজন সিংহ গর্জনে 'পাক্কা সাহেব'দের যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করে। পাক্কা সাহেব কথাটা উচ্চারণের সময়ে সুভাষের ওষ্ঠে যে কঠিন বক্রতা ফুটে উঠ্‌ত সে বড় মর্ম্মান্তিক। যৌবনের ধর্ম্মই স্রোতের ধাক্কা পেলে সেই টানে নিজেকে বইয়ে দেওয়া। হয়ত একদিন সুভাষের বৃহত্তর ব্যক্তিত্ব আমাকে দেশপ্রেমী করে তুল্‌ত—কিন্তু সেই সময়ে আমার দেখা হয় আরও বড় দু'জন মনীষীর সঙ্গে। এই সময়ে আমি দেখা করি রোমাঁ রোলাঁ এবং বার্টরাণ্ড রাসেলের সঙ্গে। তাঁদের উত্তুঙ্গ ব্যক্তিত্বের প্রভাব আমাকে যেন সুভাষের হাত থেকে উদ্ধার করল, অবশ্য রোমাঁ রোলাঁ সম্বন্ধে সুভাষের তখনও পর্য্যন্ত খুব একটা বড় রকমের শ্রদ্ধা ছিলনা, অবশ্য তারপর তিনি বিবেকানন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনতত্ত্বের ওপর বই লেখায় সুভাষের এই মত বদ্‌লেছিল। আর বার্টরাণ্ড রাসেল সম্বন্ধে সুভাষ শ্রদ্ধাবান ছিল, তাঁর গভীর চিন্তায় স্পষ্ট প্রকাশ তার চোখে প্রশংসার উজ্জ্বলতা আনতে পারত দেখেছি—তবে তার শ্রদ্ধায় ঠিক আমার মত গভীর বিস্ময় ছিল না। রাসেল সম্বন্ধে আমার যা উচ্চ ধারণা তার দশ আনার একআনাও যদি তার থাকত।

কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যেন সুভাষ ইউরোপ থেকে চলে আসার পরেই আমি রাসেলের বেশি ভক্ত হয়ে উঠি। সুভাষ যতদিন ছিল ওখানে ততদিন আমার অবস্থা ছিল মন্ত্রৌষধিরুদ্ধবীর্য্য—সুভাষের ব্যক্তিত্বে আচ্ছন্ন আমি। আমার স্বেচ্ছা,

যৌবনের স্বভাবসিদ্ধ বিদ্রোহীভাব সব কিছুই সুভাষের যাদুকরী প্রভাবে মাথা তুলতে পারত না। এ অবস্থা শুধু একা আমারি হয়েছিল তা নয় সে সময়ে যত বাঙালী ছিল ইংলণ্ডে তাদের মধ্যে কেউ বাদ ছিল না—সবাই কেউ বা প্রকাশ্যে কেউ বা নিরবে সুভাষকে আমাদের নেতা বলে মেনে নিয়েছিল। এমন কি অনেক অবাঙালী, যখন কথাটা প্রকাশ করা গেল যে সুভাষ পদত্যাগ করবে, তখন যেচে এসে উৎসাহ দিত।

এবারে আমি কেম্‌ব্রিজের জীবনের মজার মজার ঘটনা নিয়ে আলোচনা করব। সুভাষের মনে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করতাম আমি।

সাত

আগেই বলেছি যে সুভাষ আজন্ম দেশ প্রেমিক এবং কর্ম্মযোগী ছিল। তার অশান্ত সন্ধানী জিজ্ঞাসু স্বভাব দেখতে পারত না তামাসকতা। তাই ইংরাজদের স্বভাবের অনেক কিছুরই সে প্রশংসা করত: ওদের কর্ম্মস্পৃহা, নিয়মানুবর্ত্তিতা এই সবই সংঘবদ্ধভাবে কাজে সাহায্য করে এ বিশ্বাস সুভাষের ছিল। সে কেম্‌ব্রিজ থেকে একখানা চিঠিতে লিখেছিল, এখানকার লোকেদের সময় সম্বন্ধে চেতনা আছে, আর প্রত্যেক কাজেরই একটা বাঁধাধরা ধারা আছে···হ্যাঁ দোষ ক্রটী এদের অনেক থাকতে পারে, কিন্তু তাই বলে এদের মধ্যে যেগুলো ভালো সেগুলি নমস্য। অনেক সময় সে কথাবার্ত্তার মধ্যে সামরিক শব্দ ব্যবহার করত। এ থেকে তার পরবর্ত্তী জীবনে যে সব ঘটনা ঘটেছিল তাতে আলোকসম্পাত হয়। যে অসুবিধা এবং বাধা তার পথকে দুর্গম করে তুল্‌তে চেষ্টা করেছে, তার বিরুদ্ধে অভিযান করায় তার ছিল আনন্দ। এমন কি শুধু প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করতেই যে সে ভালোবাসত তা নয়, মনে মনে চাইত তার বিপক্ষে কেউ এসে দাঁড়াক, হোক না সে যতই শক্তিমান, সাহসিকতার দুর্জ্জয় আনন্দ, আগুয়ান হবার পরমগৌরবের দিকে তার স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল বই কি। বিপুলবার্য্যসম্ভার যার জাবনে সে কিছুতেই পারে না সংযত হয়ে থাকতে,—হয়ত সেই জন্যেই তাদের এই অদম্য গতি নিয়ে যায় ভুল পথে তাতে বুদ্ধির অপব্যবহার হয় হোক। কারণ এ শক্তিকে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারে না, এর স্বভাব চলা, একে পথ ছেড়ে দিতেই হবে। সুভাষ বিতর্ক

সভার ব্যবস্থা করত। ইউরোপীয় কূটনীতির শুষ্ক, সূক্ষ্ম সব কিছু নিয়ে বিস্তর আলোচনা করত, অখ্যাত উড়ো রাজনীতিক যাদের নাম কোনদিন কেউ শোনেনি তাদের নিয়ে হৈ হৈ করত। যারা কেবল নির্ব্বাচনী যুদ্ধের সময় হঠাৎ গজিয়ে উঠত তারপর আবার হারিয়ে তলিয়ে যেত তাদের নিয়েই কী কাণ্ড সুভাষের।
আমিও সাধ্যমত নিজের দিক নিয়ে উঠে পড়ে লেগে গিয়েছিলাম : যে সব শিল্পীদের খ্যাতি সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল তাদের সঙ্গে হরদম মেলামেশা করা, অর্থহীন নাটক পড়া, পিয়ানোর ওপর জারিজুরি ক'রে সময় নষ্ট করা আর যত রাজ্যের ফরাসী ও রুশ উপন্যাস গেলা নিয়েই আমি মেতে থাকি। সুভাষ এসব মোটেই পছন্দ করত না, আমায় বকত—"কেন মিছেমিছি এই সব তুচ্ছ জিনিসের পিছনে তোমার মূল্যবান সময় নষ্ট করছ দিলীপ?" সে কতবার আমায় এ কথা বলেছে। অবশ্য তার কথার পাল্টা জবাবে আমি সাহস করিনি বল্‌তে যে, সে আমায় যা বল্‌ছে তাকেও আমি ঠিক সেই কথাই বল্‌তে চাই। তার প্রতিবাদের সিংহগর্জ্জনের সামনে দাঁড়াবার মত বুকের পাটা কজনের থাকে যে তাকে হঠিয়ে দেবে! তা ছাড়া সে যে আটমাসের মধ্যে পাশ করলে তারওপর আবার প্রবন্ধে পেলে এত নম্বর যা আর কেউ কখনও পায়নি। তার্কিক হিসেবেও সে দুর্দ্ধর্ষ হয়ে উঠেছে! হ্যাঁ তার কাছে বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য। প্রশংসাও করতে হয় : সব সময়ে সে গোছ-গাছ থাকত, কখনও দেখিনি যে তার সোফা অথবা কৌচে কোনো বই পড়ে রয়েছে, এদিক দিয়ে আমরা তেমন হুঁশিয়ার ছিলাম না কি না। তার ঘরের কাগজ পত্র থেকে সব কিছুই যখনই দেখি বেশ গোছানো থাকত। জামাকাপড়ও সর্ব্বদা পরিষ্কার। তার পোশাকের চাকচিক্য না থাকলেও, কোথাও খুঁত থাকত না—নিখুঁত ভাঁজ একটু এদিক ওদিক দেখিনি তার ট্রাউজারে, না দেখেছি কোটে কোনো নোংরা দাগ। আমার কাছে আবার এ সব যেন নিছক পাগলামী মনে হত। 'রোমে গেলে রোমানদের চালেই চল্‌তে হবে।' এটা সুভাষকে প্রায়ই বল্‌তে শুনেছি। কিন্তু আমি ভারতীয়ের মত থাকতে চল্‌তে পারলেই সুস্থ থাকি, তা সে পৃথিবীর যেখানেই থাকি না কেন। কথাটা বল্‌লে কিরকম বেখাপ্পা শোনাবে, কিন্তু সুভাষ মর্ম্মে মর্ম্মে নিজেকে ভারতীয় মনে করলেও সবচেয়ে সে যখন দেশপ্রেমের নিখুঁত নিদর্শন দিত তখন ভারত-

বর্ষীয়ের মত তাকে মনে হ'ত না মোটেই। অবশ্য তার একমাত্র লক্ষ্য ছিল ভারতের সুনাম অর্জন করা। "ইংলণ্ডের মত আমাদের ভারতবর্ষও আশা করে যে প্রত্যেকটি লোক তার কর্ত্তব্য পালন করবে।" এও ছিল সুভাষের আর একটি বক্তব্য, যা সে প্রায়ই বল্‌ত। "আর ভ্যাখো, মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা ক'র না—আগুন নিয়ে ছেলে খেলা ক'র না দোহাই।" একথাটাও তার মুখে শুনতে হ'ত। সবচেয়ে আশ্চর্য্যের কথা আমরা তার এই সব মৌখিক নির্দ্দেশ মেনে চল্‌তাম! যেমন বলি:

ছেলেবেলা থেকেই আমার পায়ের ওপর পা দিয়ে বসা অভ্যাস। সুভাষ কেম্‌ব্রিজে আসবার আগে আমি রোজ রাত্রে আমার ঘরে ধুতি প'রে আসন ক'রে বসতাম। কিন্তু সুভাষ এসেই তীব্র প্রতিবাদ করলে—"না, কিছুতেই তুমি পারবে না দিলীপ ওসব থাক। দরজা বন্ধ করেই বা ওরকম আসনে বসার দরকার কি? একদিন না একদিন এটা প্রকাশ হয়ে যাবে।"

আর একটা। আমি একটু জোরে কথা বলি, সেই সঙ্গে মুখ ভঙ্গিও নানা রকম হয়। অভ্রান্ত সুভাষ বল্‌লে "ওসব এখানে চলে না। কি ক'রে সংযত কণ্ঠে কথা বলতে হয় শেখো। আর দোহাই তোমার কথা বল্‌তে গিয়ে ওরকম হাত পা ছুঁড়ো না।"

এ যে আমার পক্ষে কি সাংঘাতিক ব্যাপার! কিন্তু মনে মনে নিজের উষ্মাটুকু হজম ক'রে নিয়ে সর্দ্দারের কথা মান্‌তে প্রস্তুত হই। হ্যাঁ সে-ই ত আমাদের দলপতি। আর সে কি বলে নি; "তোমার একমাত্র চেষ্টা এবং লক্ষ্য হওয়া চাই যে, পশ্চাতে রেখে যাবে নিজের নিখুঁত সপ্রতিভ দৃঢ়তার ছাপ। কারণ এই ছোট দ্বীপের লোকের কল্পনা শক্তি খুবই অল্প, এটা খাঁটি সত্য—এরা পারে না সভ্যতার খোসাটাকে শাঁস থেকে আলাদা ক'রে দেখতে। মানে সংস্কৃতির সারবস্তু আর ভুষিমালের তফাৎটা ওদের জানা নেই।"

—"তা হলে তুমিই বা অত মাথা ঘামাও কেন এই বুড়বাক বর্ব্বরদের কি ধারণা হবে না হবে তাই নিয়ে?" আমি কতকটা রেগে গিয়েই বলি, এতে যেন সুভাষের আত্মদৈন্যই প্রকাশ হয়েছে।

কিন্তু তার এ সম্বন্ধে কোনোদিন সংশয় জাগেনি: একে সে বল্‌ত উৎকর্ষতার

পরিচয়—"আমরা ওদের স্রেফ বুঝিয়ে দেবো যে আমরা ওদের চেয়ে বড়। মোদ্দা ওদের ঘরে এসে ওদের জব্দ ক'রে যেতে পারি তবেই ত!"
এ ছিল তার কথা, প্রতিবাদ করব না, কারণ তার স্বপক্ষেও বলবার আছে। শুধু এইটুকু বল্‌ব যে, আমার সায় ছিল না এতে। আমার মতামত যাই হোক না কেন, জন কয়েক ছাড়া আর সবাই সুভাষের এই আত্মদৈন্যকে একটা বড় কথা বলে ধরে নিয়েছিল। * অবশ্য এই জন কয়েকের মধ্যে আমি পড়ি না কারণ সুভাষ ইউরোপ থেকে চলে যাবার পরই আমার বুদ্ধি খুলেছিল তার আগে আমি তার তাঁবেই ছিলাম একরকম। আর বাকী সবাইএর কাছে সুভাষ ছিল বড় লোক। কেউ কেউ দাবী করত সুভাষ এর মধ্যেই 'মহামানব' হয়ে গেছে। কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকটি লোক হিংসাপরবশতঃ সুভাষকে দাবিয়ে রাখবার চেষ্টা করত, বলত ওর সমস্তটাই চালিয়াতি। অবশ্য তাদের কথা কেউ গ্রাহ্যই করত না—বিশেষ ক'রে আমরা! আর সুভাষ কেবল ইংরাজদের খুশি করবার জন্যই সদাব্যস্ত ফলে সে তার দেশবাসীদের সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করেই চল্‌ত। হয়ত এ কথাটা বলা আমার ঠিক হ'ল না, অবিচার হ'ল তার প্রতি—কারণ ভারতের রাজনৈতিক মুক্তির সমস্যা নিয়ে সে সর্ব্বদা এমনই নিযুক্ত থাকত যে তার অন্তরের আশা ও স্বপ্নের আদর্শ কর্ম্মপথের একান্ত দরকারী নয় এমন সব ব্যাপার নিয়ে ভাববার ফুরসৎই মিলত না। আর স্বদেশের লোক যারা তার কাজের সমালোচনা করত তাদের সে বরাবরই একটু প্রকাশ্যেই অবজ্ঞা করত, সুভাষ বল্‌ত ওদের 'দাসমনোবৃত্তি'। দেশবন্ধুর একটি উক্তি তার মুখে প্রায়ই শোনা যেত; তিনি অনেক দুঃখে বলেছিলেন: 'সবচেয়ে দুঃখের কথা আমাকে স্বরাজের জন্যে যত লড়তে হয়েছে ইংরাজদের সঙ্গে—তার চেয়ে ঢের বেশি বাধা পেয়েছি আমার দেশবাসীর কাছ থেকে।' এই কথার পুনরাবৃত্তি করতে গিয়ে সুভাষের চোখ জলে উঠ্‌ত। ইংলণ্ডে থাকতে সে

* পরে অবশ্য সে তার এই মত শুধরে ছিল, কিন্তু ঠিক সেই সময়ে তার নিজের এই উত্তমমন্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে নি, নইলে কি লিখত সে: "সবচেয়ে বেশি আনন্দ পাই যখন দেখি শ্বেতকায় কোনো লোক আমার কাজ করছে, জুতো পরিষ্কার ক'রে দিচ্ছে।" (চিঠি ১২।১১।১৯ কেম্‌ব্রিজ)

রবীন্দ্রনাথ থেকে একটি পদ প্রায়ই গুন্‌গুনিয়ে শোনাতো, "জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন"।

একমুখীনতা দিয়ে মানুষের শ্রদ্ধা আদায় করা যায়—কারণ সাধারণ মানুষ স্বভাবতই একনিষ্ঠ হয় না। সুভাষের স্বভাবে মাঝে মাঝে সহনশীলতার অভাব অথবা একটু আধটু ত্রুটী থাকা সত্বেও তার মর্য্যাদার কিছু মাত্র হানি হ'ত না, কারণ আমরা তার কাছাকাছি পৌছতে পারে এমন কাউকে দেখিনি—বিশেষ ক'রে ইংলণ্ডের কলেজ জীবনে! অবশ্য কয়েকজন ভালোছেলে ছিল তবে তারা একান্তই গ্রন্থকীট —তাদের প্রশংসা করা যায় বটে কিন্তু শ্রদ্ধার পাত্র তারা মোটেই নয়। এখানে আবার সুভাষ স্বয়ং হাজির যে নাকি বইয়ের পাতায় মুখ গুঁজে না থেকেও এমনিতেই বলে বলে এই সব গ্রন্থকীটদের মেরে দিত। এতে যদি আমরা তাকে বড়রকমের কিছু ভেবে থাকি ত তাতে অন্যায় কিছু হয়নি।

আট

যদি পরবর্ত্তীকালে সুভাষ তার এই ত্রুটীটা না শোধরাতে পারত তাহলে অবশ্য যে আলোচনাটা করতে যাচ্ছি সেটা আমার পক্ষে অসুবিধে হত। তার এই মত পরিবর্ত্তনে পরিণত বুদ্ধিরই পরিচয় দিয়েছিল সে। যাদের সে অসচ্চরিত্র বলে মনে করত তাদের অবজ্ঞারও অযোগ্য বলে সে ঘৃণা করত। আমার মনে আছে আমাদের এক কবিবন্ধু (তাকে আমি খুব ভালোবাসতাম) এক সময়ে খুব বেশি মদ খেয়ে বেসামাল হয়ে পড়ত, মেয়ে মহলে তার খ্যাতি হারাবার কোনো দায় ছিল না। কোনো চায়ের নিমন্ত্রণে যদি হঠাৎ সামনাসামনি দেখা হয়ে যেত সুভাষ স্রেফ তাকে চিনতেই পারত না। তার সম্বন্ধে আমার কিছু স্নেহ আছে এই অপরাধেই কতদিন সুভাষের কাছে বকুনি খেয়েছি। এমন বিরক্ত হয়ে সুভাষ বল্‌ত—"একেবারে অসহ্য! তুমি কি করে বরদাস্ত কর?" ফলে আমি তার কথার প্রতিবাদে কোনো যুক্তিতর্কের অবতারনার সাহস পেতাম না,—কেন এই মানুষটি পুরোপুরি সহনীয় তা নিয়ে!

বহুদিন পরে হঠাৎ সুভাষ সকালে এসে হাজির কলকাতার বাড়িতে—"দিলীপ, তোমায় একটা অনুরোধ করব।"—

'কি ?"

'অমুক একেবারে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সত্যি সে মানুষ হিসেবে চমৎকার, কিন্তু এই াদ অভ্যেসটায় সব মাটি হয়ে যাচ্ছে—আমি কি বল্‌ছি বুঝেছ ? কেন আমি কতবার লেছি, আমাদের ভারতবাসীদের পক্ষে পানের অভ্যেসটা খুব বিপদজনক—তা স যত অল্পই হোক। আজও আমি সেই কথাই বলি। একবার অমুকের কথা নে ক'রে ত্থাখো, তখন মুখে কত বড় বড় বুলি আওড়াতো, পাশ্চাত্য সভ্যতার াতি ভক্তিতে—'মদ খাওয়া সম্বন্ধে কারুরই কোনো আপত্তি থাকা উচিত নয় কারণ দ খাওয়া আর মাতাল হওয়া তুটো এক নয়।' আরও কত কী ! কিন্তু দিলীপ ামরা ত দেখেছি ভারতবর্ষের কত বড় বড় লোক এর জন্যে নষ্ট হয়ে গেছে। মুক ত একটা দৃষ্টান্ত মাত্র।"

-"অবশ্য ! কিন্তু এর মধ্যে আমি এলাম কি ক'রে ?"

-"দোহাই এনিয়ে তামাসা ক'রনা আমি খুব সিরিয়াস—তুঃখও হয়। আমি চাই মি তার সঙ্গে ঘন ঘন দেখা কর। তোমার সঙ্গ দিয়ে তাকে সাহায্য করো। তাকে ই সর্ব্বনাশা অভ্যাসের হাত থেকে উদ্ধার করতেই হবে যেমন করেই হোক।"

াবনের কঠিন কষ্টিপাথরে পড়ে সুভাষ শিক্ষা পেয়েছে অবশেষে—দয়া এবং হনশীলতা অর্জন ক'রেছে। কিন্তু আমি বল্‌ব দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সংস্পর্শের ভাবেই সুভাষ এটা পেয়েছে।

ই প্রসঙ্গে আর একটা কথা মনে পড়ে গেল, সুভাষ একটা মন্তব্য করতে গিয়ে জের অজ্ঞাতে ভারি মজার কথা বলেছিল। মনে হয় ১৯২৪ সালে দেশবন্ধুর ত্যুর কয়েক মাস আগে। আমরা তু'জনে ফিস্‌ফিস্ করে প্রেম নিয়ে কথা কইছি। ামি অত্যন্ত বিষন্ন এবং উদ্বিগ্ন। কাজে কাজেই সে আমায় ভরসা যোগাচ্ছে।

্যা, আমি বুঝেছি।" বল্‌লে সে খুব গম্ভীর ভাবে—"কারণ জেলে বসে বৈষ্ণব হিত্যের আদিরসাত্মক সবকিছুই পড়েছি কি না।"

বাঃ বহুৎ আচ্ছা !" বলে হেসে উঠি, "পুঁথিসমুদ্র পারংগত হয়ে তুমি রাতারাতি এদিকে এগিয়ে চলেছ এটা নতুন খবর বই কি। খবরটা প্রচার করে দিই, তদিন যারা তোমায় শিশু বলে উড়িয়ে দিত তাদের সতর্ক হবার সময় এসেছে— । শিশু যে আর শিশু নেই, হঠাৎ বড় হয়ে উঠেছে !"

এই কথোপকথন থেকেই বোঝা যায় যে সুভাষের জীবনে যৌন প্রণয়ের কোন স্পর্শ ছিল না। হয়ত জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্তও।

আমরা আবার কেম্‌ব্রিজে ফিরে যাই।

নয়

আমি আগেই বলেছি যে আমাদের ফিট্‌জ উইলিয়াম হল্‌-এ সুভাষের জন্য একটা সীট যোগাড় ক'রে ছিলাম। অবশ্য এটা খুব সহজে সম্ভব হয়নি। ব্যাপারটা হয়েছিল কেমন বল্‌ছি।

আমি ত ১৯১৯ জুনে লণ্ডন পৌঁছলাম। এবং নিজের ব্যবস্থা করে নিলাম ফিট্‌জ উইলিয়াম হলে, পরে এটা নিয়মিত কলেজ গিয়েছে অবশ্য। সুভাষ আমায় তার করলে, সে লণ্ডনে আস্‌ছে—কেম্‌ব্রিজের একটা কলেজে ভর্ত্তি হতে চায়। আমি স্বর্গমর্ত্তপাতাল তোলপাড় ক'রেও কোনো হদিস পেলাম না, ভারতীয়দের জন্য যে ক'টা সীট বরাদ্দ তা কবে ভর্ত্তি হয়ে গেছে। অবশেষে অনেক কাণ্ড ক'রে তাকে আমাদের হলেই ভর্ত্তি করা সম্ভব হল। এতে আমি খুব খুশি। আর সুভাষ আমার কাছে কী যে কৃতজ্ঞ! সে কখনও কোনো উপকারই নিজের প্রাপ্য মনে ক'রে স্বাভাবিক ভাবে নিতে পারত না অন্তরে সে দরদী ছিল খুবই, আপন ছিল আরও। তার কৃতজ্ঞতা কখনও উচ্ছ্বাসের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেতো না, কুণ্ঠিত সঙ্কোচের মাধুর্য্য ছিল তার স্বভাবে। তার বন্ধুত্বের জ্যোতির্ম্ময় সৌভাগ্য যে সামান্য কয়েকটি প্রাণীর জীবনকে আলোকিত করেছিল তারা কি আর বাহ্যিক উচ্ছ্বাসভরা গদ গদ ভাব পছন্দ করবে! সে যেন আমাদের রুচির উন্নতি ঘটিয়েছে। আমার আবার স্বভাব সাধারণতঃ মনের আবেগ প্রকাশ করা, বাহবা দেওয়া। উচ্ছ্বাস করা কিন্তু সুভাষের প্রকৃতি নয়। তবে আমার স্বভাব সম্বন্ধে তার সহানুভূতি যে একেবারে ছিল না তা নয়, সে প্রায়ই হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌ত—"তুমি হচ্ছ শিল্পী, দিলীপ। তা তুমি পারো বইকি—মনের ভাব নানাভাবে প্রকাশ করবার কলকৌশল জানা আছে, আমরা ভাই নিতান্তই সাধারণ মানুষ, পারি না।"

এই ধরণের হাল্কা আলাপে হাসির কথায় আমরা কৃতার্থ হয়ে যেতাম। কেউ কেউ একে ব্যক্তিগত বাড়তি ভালোবাসা মনে করে বেশি খুশি হত। কারণ সুভাষের

চেহারার মধ্যে এমন একটা পবিত্রতার গাম্ভীর্য্য ছিল যে, সে যদি কোনো সময়ে কোনো কিছু নিয়ে হাসি তামাসা করত তাহলে আমরা আশ্চর্য্য হয়ে যেতাম—তার মত অসাধারণ ছেলের পক্ষে আমাদের স্তরে নেমে আসাটা কম আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু এর পরিবর্ত্তে আমাদের দুর্ভোগ কম ভুগতে হ'ত না। কেমন বলি—আমাদের মধ্যে একটি পাঞ্জাবী ছোকরা ছিল—ধরা যাক তার নাম সিং। সে পুরোদস্তুর বোহেমিয়ান চালে চ'লত। সে সাংঘাতিক রকমের অশ্লীল গল্প বল্‌ত। নানারকমের নোংরামির বিচিত্র কাহিনী বল্‌তেও তার এতটুকু আটকাতো না। আমরাই কি কম, নবীনযুবক বাঁধভাঙা বিদ্রোহী উচ্চশির, পরোয়া করি না কিছুরই, স্বাধীনতার গর্বে স্ফীত—কাজেই সিং-এর অশ্লীল কথাবার্তা ভালো লাগুক আর না-ই লাগুক বীরত্ব সহকারে তার আলোচনায় উৎসাহ দিয়ে যেতাম—এটাই তারুণ্যের দস্তুর। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই আমরা তার একঘেয়ে যৌনকাহিনী শুনে শুনে বিরক্ত হয়ে উঠি। যতসব বাজে স্থূল গল্প। কিন্তু সে ছোক্‌রা ওই সব আলোচনা ছাড়া থাকতে পারে না. এদিকে আমরাও ভেবে পাইনা সিং'কে সহজে কি করে কায়দা করি। এবং আমরা পারিনি তাকে দমিয়ে রাখতে। মহাসমস্যা। এমন সময়ে দৈবপ্রেরিতের মত একটি ওষুধ পাওয়া গেল—সেটা আর কিছু নয়, সুভাষের উপস্থিতি। সুভাষকে দেখবামাত্র সিং একেবারে মুখ বুজে সঙ্কুচিত হয়ে বসত। এমন নয় যে 'গোঁড়া' লোকটিকে খাতির করে সিং নিজেকে সংযত রাখত—সে সুভাষের সামনে মুখ খোলবার যতই চেষ্টা করেছে পারেনি। আড়ালে সুভাষকে গোঁড়া বলে ঠাট্টা করত। একদিন সে অত্যন্ত দুঃখিত ভাবেই বলে ফেল্‌লে—কেন যে এমন হয় সে নিজেই বুঝতে পারে না।

আমি বলি—"কি ?"

—"বোসের সামনে আমি কেমন নিস্তেজ হয়ে পড়ি যেন।"

আমরা জানি সিং সুভাষকে মোটেই দেখতে পারে না। কারণ গোড়া থেকেই সুভাষ তাকে অবজ্ঞার চোখে দেখেছিল। কাজে কাজেই সিংএর মনে মনে ইচ্ছে ছিল সুভাষকে জব্দ করবার—এবং হয়ত করতও যদি তার সে শক্তি থাকত। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও সে সুভাষের সামনে সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠ্‌তে পারত না। শুধু সিংই একমাত্র ব্যক্তি নয়, আমাদের মধ্যে এমন অনেক বাচাল শর্ম্মা সুভাষের

সামনে স্তব্ধ হয়ে থাকত। প্রেসিডেন্সী কলেজের ডিবেটিং ক্লাবেও এটা আমি লক্ষ্য করেছি। তখন সেটা স্বাভাবিক মনে হ'ত। আমাদের দেশের ছেলেরা সত্যিই উচ্ছৃঙ্খল অবাধ্য নয়। একথাটা আরও বেশি ক'রে বোঝা যায় যখন বিলেতের অপরিণতবয়স্ক আণ্ডারগ্রাজুয়েটদের কাণ্ডকারখানা দেখি। শুধু মদ খেয়ে মাতলামিই নয়, মারামারি করাই নয়, এরা এই বয়সে মেয়েদের নিয়ে উধাও হয়ে যায়, আর তখন হয়ত আমাদের দেশের ছেলেরা 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি তুলছে অথবা কালো পতাকা ওড়াচ্ছে। কিন্তু সুভাষ এই কেম্‌ব্রিজে এবং শেষে লণ্ডনেও নিজের উপস্থিতি দিয়ে অনেক বদমেজাজী বেয়াদপকে ভালো ছেলে বানিয়ে দিয়েছে দেখেছি। সে হাসিতামাসায় যোগ দিয়ে প্রাণ খুলে হাসতে পারত—কিন্তু নোংরা কোনো কিছু সে সইবে এটা কেউ ভাবতেও পারত না।

এক এক সময় আমার মনে হ'ত অনেক ক্ষেত্রে তার ভালো লাগত না বলেই হয়ত অপরের প্রতি ভ্রূকুটি করত। অবশ্য বেশি বকা তার কোষ্ঠিতে লেখেনি। তর্ক সভায় সে উৎসাহিতভাবেই যোগ দিত বটে কিন্তু সেখানে ত যুক্তিবদ্ধ বক্তৃতাই হয়। আর গল্পগুজব আমরা করতাম: সে নয়। হয়ত কোনো সময়ে সে কারুর কারুর সম্বন্ধে কঠোর সমালোচনা করত কিন্তু তার ভাষা যেমন সংযত তেমনি সংক্ষিপ্ত। গল্পের জন্যে গল্প করা, এ তার স্বভাবের কোথাও দেখিনি। আর, সে কখনও মেয়েদের সম্বন্ধে কোনো আলোচনা করত না, মেশা ত দূরের কথা। ইংলণ্ডেও তাকে দেখেছি এইভাবে চল্‌তে। কেবল একটি মাত্র ইংরাজ মহিলার সঙ্গে তার সত্যিকার বন্ধুত্ব হয়েছিল: তিনি মিসেস্ এন, আর, ধরমবীর। মিসেস্ ধরমবীর-এর পিতামাতা দু'জনেই ইংরাজ। তিনি রাশিয়াতে মানুষ হন। ফরাসী এবং ইংরাজীতে কথা কওয়া তাঁর অভ্যাস। তিনি পাঞ্জাবী ডাক্তার ধরমবীরকে বিবাহ করেন। ডাক্তার ধরমবীর ল্যাঙ্কাশায়ারে বেশ পসার জমিয়েছেন। আমি সুভাষকে অনেক ব'লে কয়ে শেষে, ১৯২১ সালে তাঁদের ল্যাঙ্কাশয়ারের বাড়িতে যাবার জন্যে রাজী করালাম। দু'জনেই তাঁদের ওখানে গিয়ে উঠি। মিসেস্ ধরমবীরের সুন্দর ব্যবহারে, আতিথেয়তায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে 'দিদি' বলেছিল সুভাষ। ইংলণ্ডের এই একটি মাত্র মহিলার কাছে সুভাষ উচ্ছ্বসিত হয়ে মনের দুয়ার উন্মুক্ত করেছিল। একথাটা আমি উল্লেখ করলাম তার কারণ

সুভাষ কখনই মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশায় বা যে কোনো আদান প্রদানের সময়ে নিজের স্বাভাবিক কুণ্ঠা সঙ্কোচ ও আড়ষ্টতা কাটিয়ে উঠতে পারত না। মেয়েদের দেখলেই সে কেমন আড়ষ্ট হয়ে যেত। অবশ্য বিলেত থেকে ফিরে, এখানে এসে আস্তে আস্তে সেটা কাটিয়ে উঠ্‌তে পেরেছিল সুভাষ। ইদানীং সে আর মেয়েদের কাছ থেকে নিজেকে দূরে দূরে সরিয়ে রাখত না। ক্রমশঃ সে বুঝতে পেরেছিল যে মেয়েদের সঙ্গেও মেশার প্রয়োজন আছে, তাদের কাছে শিক্ষারও কিছু রয়েছে, তাদের শুভেচ্ছার মূল্য রয়েছে: ব্যাস ওই পর্য্যন্ত এসেই থেমে গিয়েছিল সে। তার সন্ন্যাসীর মত নির্লিপ্ত ঔদাসীন্যের কাছে কোনো রমণীর অন্তরের আবেগপ্রবাহ কোনো প্রতিধ্বনি জাগিয়ে তুলতে পারে নি। অবশ্য এদিক দিয়ে তার দু'একটি ভাইঝি অশেষ সৌভাগ্যের অধিকারিণী, তারা ছোটবেলা থেকে এই সেদিন পর্য্যন্তও সমানে নিজেদের আব্দার জাহির করে এসেছে।···হ্যাঁ, আমরা ইংলণ্ডের কথায় আসি।

সে প্রায়ই আমাদের সতর্ক ক'রে দিত—আমাদের বল্‌তে, যে ক'টি বন্ধুর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তার আশা ও চিন্তা ছিল তাদের, সে কেবলই সাম্‌লাতে চাইত, পাছে তারা তথাকথিত পাশ্চাত্য সভ্যতার দু'টি প্রলোভনে না পড়ে যায়। এ দুটির দিকে ঝোঁক সবারই। সুরা আর সুন্দরী। মেয়েদের দিকে যারা নির্লজ্জভাবে তাকাতো, বেহায়ার মত মেলামেশা করতো তাদের ওপর সুভাষ মোটেই খুশি ছিল না। আবার তার এই প্রতিক্রিয়া এক একজনের ভাগ্যে বিভিন্ন চেহারায় আত্মপ্রকাশ করত। আমি জানি একটি বড় লোকের ছেলে স্রেফ সুভাষের ভ্রূকুটির চোটে ভালো হয়ে গেল। তার আগে অবশ্য রমণীবিজয় পর্ব্বে সে ছিল সিদ্ধ পুরুষ। সেই ছেলেটি ছাড়াও ত অনেকে সুভাষের ভয়ে মেয়েদের গায়ে পড়া ভাব সত্ত্বেও মিশতে সাহস করত না—পাছে সুভাষ তাদের সঙ্গে না মেশে, এই ভয়ে। অবশ্য আমি নিজেও এই দলের মধ্যে আছি। সত্যি কথা বলতে কি, সুন্দরী মেয়েদের দিকে টান আমার বরাবর, কিন্তু তা হ'লেই বা করছি কি, সুভাষ থাকতে আমার কোনো উপায় ছিল না। যখন চিত্তাকাশে বিষাদের মেঘ জমে থাকে লজ্জায়, লোভে, ভয়ে, তখন কাজল কালো চোখের কোমল কটাক্ষ পারে না টান্‌তে—দলপতির রোষকষায়িত বজ্র ভ্রূকুটির কাছে তাকে পরাভব স্বীকার করতেই হয়।

আমাদের মত তরুণ আশাবাদীদের মধ্যে কত রকমের ছেলেই না ছিল : কেউ কেউ মেয়েদের সঙ্গে কঠোর ব্যবহার করবার জন্য অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব। তারা বল্‌তো মেয়েরা হচ্ছে 'নরকের দ্বার'। আবার কেউ কেউ মেয়েদের হঠিয়ে দিত পুরুষদের পবিত্রতা নষ্ট করে ব'লে। আরও একদল, তারা মনে মনে চাইত মেয়েদের সঙ্গে মিশতে, কিন্তু কাছাকাছি গিয়েও শেষ পর্য্যন্ত পারত না কায়দা করতে।...এরা সকলেই সুভাষের দিকে চেয়ে থাকত—আবিষ্কার করবার চেষ্টা করত সুভাষ কোথা হ'তে পায় এত শক্তি, এই বীরত্বব্যঞ্জক বলিষ্ঠ চরিত্র, সম্পদ। যারা এর কোনো সঙ্গত অর্থ খুঁজে না পেত তারা সুভাষের অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যের প্রশংসা করত। কারণ সারা ইংলণ্ডে তখন তপশ্চর্য্যায় তার মত আর কারও এত তীব্র নিষ্ঠা ছিল না। বিশেষ ক'রে তারা সবাই অবাক হয়ে যেতো সুভাষের আত্মশক্তি দেখে, কারণ মেয়েরা তার সঙ্গ পাবার জন্য অধীর, অস্থির। কেবল সুভাষের রূপ আর যৌবন দেখেই যে শুধু তারা চঞ্চল হয়ে উঠত তা নয়,—তাকে পাওয়া যাবে না এই দুর্লভতার আকর্ষণও বড় সামান্য ছিল না। আমার মনে হ'ত যে মেয়েদের এই কামনা সুভাষের ভালো লাগত। অবশ্য তাই ব'লে তাদের লোভ দেখানোর মত হাল্কা মনোবৃত্তিই তার নয়। আমার ক্রমশ ধারণা হ'ল, মেয়েদের কামনা তার ভালো লাগত না—তাদের এই লালসা অবশেষে হতাশা থেকে যখন দুর্লভের প্রতি প্রশংসায় রূপান্তরিত হ'য়ে যেত তখনই তার কাছে সেটা প্রিয় হয়ে উঠত। আর আমরা :—সে সৌভাগ্য হয়নি আমাদের। সুভাষের প্রতি যে অনুরাগ, যে প্রশংসার গভীরতা মেয়েদের ছিল তার কণামাত্র আমরা পাইনি। কি ক'রে পাবো ? আমাদের উদাসীনতা ত অন্তরের সহজাত সত্যের উপর দাঁড়িয়ে থাকত না, সুভাষের মত উত্তুঙ্গ আদর্শনিষ্ঠা কোথায় পাবো ? আমাদের কাছে সে যেন বড় নাগালের বাইরে, উঁচু, অন্য রাজ্যের মানুষ মনে হ'ত। এক কথায় সে ছিল সেই জাতের মানুষ যাকে অনুসরণ করা যায় না সহজে কিন্তু আপ্রাণ চেষ্টায় অনুকরণ করতে ইচ্ছে হয়।

সে যখনই আর পাঁচ জনের মত সাধারণ ব্যবহার করত তখন অন্যের মনে সাময়িক ভাবে মায়া বিস্তার করত। তার কারণ আমরা অনেক ভেবে স্থির করতাম যে, সে সাধারণের চেয়ে অনেক উচ্চস্তরের মানুষ, সাধারণ দৌর্ব্বল্যের অনেক উর্দ্ধে।

কিন্তু অনেক দিন পরে বুঝতে পারলাম যে, দূরে দূরে স'রে থাকলেই সেটা দিয়ে শক্তির পরিচয় দেওয়া হয় না। কোনো চক্রান্তের পাকে জড়িয়ে পড়ার ভয়েই মানুষ এড়িয়ে চলে সেটা,—সেখানে নিজের মনকে নিয়েই যত ভয় তাই মানুষ চায় না সে পথ মাড়াতে, এই হচ্ছে তার ব্যাখ্যা। যাই হোক, আমাদের তখন অত বোঝবার বুদ্ধি হয়নি, শাদা চোখে যতটা বুঝেছি তাই বিশ্বাস করেছি। তাই সুভাষ ছিল আমাদের সামনে শক্তির স্তম্ভ, পবিত্রতার পরম গৌরব।

তাই, যখন সে সাধারণ মানুষের মতই মানুষের মনের আহ্বানে সাড়া দিত তখন অপরে সত্যিই নিজেকে কৃতার্থ বোধ করত। সে যখন একবার কোনো রমণীর প্রীতি ও স্নেহের প্রতিদানে আমাদেরই মত আচরণ করল তখন আমার কী বিস্ময়, কি উল্লাস, কি আত্মপ্রসাদ।

ধরমবীরের বাড়ি থেকে চলে আসার কয়েক মাস পরে। সুভাষ আই-সি-এস-এ ইস্তফা দিয়েছে—ইংলণ্ড আর বাংলাদেশে প্রচণ্ড আন্দোলন এই অভূতপূর্ব ব্যাপার নিয়ে চল্‌ছে। ডাক্তার ধরমবীর এলেন সুভাষকে 'সাবাস্' জানাতে—ডাক্তার নিজে সত্যিকার দেশপ্রেমিক, আর একদিকে পাঞ্জাব-কেশরী লালা লাজপৎ রায়ের বন্ধু তিনি। মাঝখান থেকে ডাক্তারের পত্নী পড়ে গেলেন একটু মুস্কিলে। একদিকে আমাদের ভারতীয়দের স্বাধীনতার স্বপক্ষে তাঁর সত্যকার সহানুভূতি ছিল যেমন, তেমনি আবার ইংরাজ মহিলা হয়ে তাঁর স্বদেশবাসীদের প্রতি স্বামীর তীব্র আক্রমণের মধ্যেও তিনি কোনো রসগ্রহণ করতে পারছিলেন না। সুভাষ তাঁর অবস্থা বুঝতে পারলে। তাঁর প্রতি সুভাষের দরদ প্রীতিসঞ্জাত! সে তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা অন্যভাবে সাম্‌লে নিলে। সুভাষের এই সজাগ সতর্ক দৃষ্টিটুকু সেই ইংরাজ মহিলার চোখ এড়ায়নি, সুভাষ তাঁর অন্তরে এমন একটা স্থান অধিকার করেছিল যে সুভাষের ভারতবর্ষ যাত্রার সময়ে তিনি খুবই বিচলিত হয়ে পড়েন। কারণ তিনি ভালো করেই জানতেন যে, এই আদর্শবাদী যুবকের যাত্রাপথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়, সে পথে কাঁটা ছড়ানো। যাক যে কথা বল্‌ছিলাম।

ধরমবীরের ওখানে সপ্তাহ খানেক কাটিয়ে আমরা দু'জনে এসে উঠলাম গাড়ির একটা ফাঁকা কামরাতে। ট্রেণের বাঁশি যখন বেজে উঠল তখন হঠাৎ ধরমবীরজায়া আমাদের দুজনের কোলের ওপর দুটি সুন্দর মোড়ক ফেলে দিলেন। ওদিকে

উনি যখন রুমাল উড়িয়ে বিদায় জানাচ্ছেন, আমি তখন একটা মোড়ক খুলে সুভাষকে দেখাই তাতে রয়েছে কিছু বাদামভাজা আর মিষ্টি, সুভাষের চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, সে ব'লে গভীর গাঢ় কণ্ঠে "মেয়েরা—সব সময়েই মেয়ে।"

তার পরে সে ইংলণ্ডের একমাত্র রমণী যার সম্বন্ধে তার অন্তরে সাড়া জেগেছিল, সেই ধরমবীরজায়াকে দীর্ঘ চিঠি লিখেছিল।

জাহাজে বসে সুভাষ লিখেছে চিঠি। দেশের পথে তার জাহাজের বাঁশি তখন বাজ্‌ছে, তার সেই অনবদ্য ইংরাজি ভাষায় সে জানিয়েছে তাঁকে ধন্যবাদ। তাঁর বোনের মত আন্তরিকতার কথাই তার কেবল মনে পড়ছে। আর সে মার্জনা চেয়েছে, তার স্বভাবের পরুষ রূঢ়তা, তার ত্রুটি বিচ্যুতি—এ সবই যেন তিনি ক্ষমা করেন! অনেক কথাই যা সে অন্তরে অনুভব করেছে কিন্তু সবই ত আর প্রকাশের ভাষা খুঁজে পায়নি—সেজন্য তিনি যেন তাকে জড় ব'লে ভুল না করেন। তার স্বভাবের সবচেয়ে বড দৈন্য মেয়েদের সামনে সে আড়ষ্টতা কাটিয়ে উঠতে পারে না কিছুতেই, তার জন্যে সুভাষ দুঃখ প্রকাশ করেছে চিঠিতে। তার এই কথাটা এত বেশি আমার মনে আছে তার কারণ আমি কোনোদিনই বুঝি নি যে সুভাষ তার নিজের সম্বন্ধে এত বেশি সচেতন। নিজেকে করুণা করার মত আর কিছুকে সে এত বেশি ঘৃণা করত না। তাই সে কখনও নিজের দোষ ত্রুটীর জন্য কোনো ক্ষোভ প্রকাশ করত না কিছুতেই। মেয়েদের সামনে সে যেন বোবা হয়ে যেত, কেমন অস্বস্তি বোধ করত। কেমন বলি একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে।

লণ্ডনে আমি একদা এক ফরাসী পরিবারে থাকতাম। এ বাড়ির কর্তা আর গিন্নী বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হন নি কোনোদিন। অবিশ্যি একথা সুভাষকে আমি বলিনি পাছে সে এদের ওপর বিরূপ হয়। সুভাষ প্রায়ই আসাযাওয়া করত এবং আমি যে ফরাসী ভাষায় জলদ কথাবার্তা কইতে প্রাণপণে চেষ্টা করি তার জন্যে সুভাষ খুব 'বাহবা' দিত। আমার গুরু ছিল এ বাড়ির মেয়ে, ছোট্ট ফুট্‌ ফুটে মেয়েটি, বয়স বছর দশেক। তার সঙ্গে আমার খেলাধূলো চল্‌ত—সে আমার খুব 'ন্যাওটা' ছিল। তাকে সুভাষেরও বেশ ভালোই লাগত, কিন্তু তবু সুভাষ কিছুতেই ভুলতে পারত না যে, মেয়েটি আসলে স্ত্রীসমাজেরই একজন। সেই মেয়েটির সঙ্গে আমাদের দু'জনের

ফটো তোলা হয়েছিল, সে ছবি আজও রয়েছে আমার কাছে। ছবিতে সুভাষ এমন বিকট গম্ভীর হয়ে আড়ষ্টভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে যেন কোনো মোহিনী রমণীর পাশে তাকে জোর করে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তাকে সর্ব্বদাই নিজের সম্বন্ধে সতর্ক থাকতে হবে—অতি কষ্টে অর্জিত এতদিনের চরিত্রবলকে রাখতে হবে !···সেদিন থেকে কুড়ি বছর পরে আমাদের থিয়েটার রোডের বাড়িতে সুভাষকে নিমন্ত্রণ করি, লীলা দেশাইএর সঙ্গে ওর আলাপ করিয়ে দিই। এবং সেইদিন এ কাহিনীটি বলি, লীলার কাছে—মেয়েদের সঙ্গে সুভাষের নিখুঁত আচরণের প্রসঙ্গেই কথাটা বলে ফেলি। "তুমি ধারণা করতে পারবে না লীলা, আমি কতটা আশ্চর্য্য হয়েছি। সুভাষ একেবারে বদ্‌লে গেছে! আরে, তোমার সঙ্গে সুভাষ যে দস্তুর মত সহজ ভাবে যুবকের মতই স্বচ্ছন্দে কথা কইছে এ যে নিজে চোখে দেখেছি! এ্যাঁ। আমি যদি সেই ফরাসী মেয়েটিকে বলি একথা সে কিছুতেই বিশ্বাস করবে না, সুভাষ এতখানি বদ্‌লে গেছে—যেন চেনাই যায় না।"

সুভাষ আমার পিঠে মৃদু একটা কিল মেরে বলে—"মিথ্যুক কোথাকার!"

সত্যি সে বদ্‌লে গেছে। সে মেয়েদের সঙ্গে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মেলামেশা করতে পারে কি না জানি না, তবে মেয়েদের সঙ্গে ব্যবহারে তার সাবলীলতা এসেছে একথা মানতেই হবে।

আমরা লণ্ডনে যে সুভাষকে দেখতে অভ্যস্ত ছিলাম তার মাধুর্য্য ছিল বই কি। না-ই বা পারুক সে মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করতে, না হয় সে গল্প গুজব আর আড্ডা-ইয়ার্কিই দিত না, না হয় সে তার অবসর সময়ে বাজে ইংরেজ বক্তাদের অসার বক্তৃতা গুলো পড়ত, না হয় সে পৃথিবীর পাঁজা পাঁজা ইতিহাসের বোঝার মধ্যে ডুবে থাকত, না হয় সে ভালো ভালো সৌখীন থিয়েটার আর অপেরায় যেতো না—তাতে কি হয়েছে? যত দুরধিগম্য অসাধ্যসাধন ক'রেই ত তার পরিণতি। আমাদের সময়ে এমন আর কোনো ছেলে ইংলণ্ডে ছিল না, যে নাকি সুভাষের দশভাগের একভাগ গুরুত্বও আরোপ করতে পারত জীবন সম্বন্ধে, এবং স্বাধীন ভারতের মুক্তিপতাকা বহনের অধিকার অর্জনের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রমে চেষ্টা করত! সুভাষের যে আধ্যাত্মিক বৃত্তি মোড় ঘুরে এগিয়েছিল দেশপ্রেমের পথে এই তার হ'ল ধ্যান জ্ঞান, এই দেশাত্মবোধই তার জীবনের

একমাত্র লক্ষ্য এবং চেতনার উৎস। সুভাষের মত আর পাঁচজনের সাধ্য নেই যে, এক এবং একই মাত্র পথের দিশায় প্রাণকে জ্বালিয়ে চল্‌তে পারে, এবং পরিশেষে যথাসর্ব্বস্ব পণ ক'রে শেষ বাজিটা ধরতে পারে মরিয়া হয়ে। দেউলিয়া হবার ভয় নেই, নেই জীবনের শঙ্কা। সে বাজি সে তখনই ধরেছিল যখন তার পশ্চাতে প্রবল প্রতিপক্ষের প্রচণ্ড বাধা উদ্যত।

অনায়াসেই তার এই পরাস্ত যুদ্ধের সমালোচনায় করা যায় বিদ্রূপ, হয়ত তার সঙ্গে মতের গরমিল হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এমন কি তার কার্য্যকলাপের গতিপদ্ধতিকে হেসে উড়িয়ে দিলেও দেওয়া যায় একগুঁয়ে ঝোঁকধরা আধপাগলা খাম্‌খেয়ালী বলে। কিন্তু তবু একটা কথা থেকে যায়,—তার অন্তরের অগ্নিশুদ্ধ আগ্রহের কাছে মাথা আপনিই নত হয়ে আসে। একজনের জীবনকে আদর্শের বেদীমূলে নির্ম্মম ভাবে ব্রতী করল যে, বাল্য কৈশোরের স্বপ্ন থেকে পরিণত বয়সের মানুষটি পর্য্যন্ত এক স্বপ্নকল্পনার প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে আহার নিদ্রা সব কিছু উপেক্ষা ক'রে যাত্রার অনির্ব্বাণ হোমাগ্নিতে আপনাকে দহন ক'রে, অপ্রতিহতবেগে সকল বাধা বিপর্য্যয়কে অগ্রাহ্য ক'রে এগিয়ে গেল যে মানুষ, তার মূল্য কি সামান্য কথায় দেওয়া যায়! হ'তে পারে তার অভিযানের সম্মুখে ছিল সমুদ্রের মত অপার অনিশ্চয়তা, ছিল হয়ত ভয়ঙ্কর বিপদের অমোঘ গহ্বর—কিন্তু তবু সে মানুষকে আমরা অবাক হয়ে দেখি, যে পারূল এতবড় অভিযানের বুকে নিজেকে ছুঁড়ে দিতে, অকম্পিত চিত্তে! এ মানুষ যদি আত্মপূজার ক্ষুধা নিয়ে না চ'লে থাকে তবে আমাদের শ্রদ্ধা যায় ধেয়ে তার পানে স্বতঃ উৎসারিত হয়ে।

সুভাষ সে রকম কিছু করেছিল কিনা আমার ঠিক জানা নেই, কারণ শেষের দিকে অনেক দিন আমার সঙ্গে তার তেমন যোগ ছিল না। ১৯৩৯ সালের পর কোনো চিঠিপত্রও লেখালিখি ছিল না। তার সম্বন্ধে অনেক বিশ্রী রটনা আমার কানে পৌছেছিল—সে নাকি খুব শক্তিপ্রিয় হয়ে উঠ্‌ছে এবং দলগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য নানারকম অসঙ্গত কাজও করছে।···কিন্তু এ সব বিষয় বিচার করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এসব কথার মূলে কতটা সত্য আছে তার যথাযথ নিরিখ করার মত সময় এবং সুযোগ দু'য়েরই অভাব। কাজেই আমি যা জানি তাই বলব, যা জানি না এমন কথায় আমার কাজ নেই। তার মধ্যে যা আমি দেখেছি,

তার কাছ থেকে যে প্রেরণা আমি পেয়েছি এবং বহু দুর্ব্বলচিত্ত মানুষ যারা তার উত্তাপে প্রবাহিত হয়ে শক্তি পেয়েছে সেই সব কথাই বল্‌তে চাই। আমি সেই মানুষটির কথাই বিশেষ ক'রে বল্‌ব, রাজনীতিকের কথা নয়।

সুভাষের জীবনে ইংলণ্ডে থাকার সময়টুকুই (১৯১৯-২১) বোধ হয় তার জীবনের সবচেয়ে গৌরবময় যুগ। কারণ এর মধ্যে ছিল না পারিপার্শ্বিকের বোঝা চাপানো বড় একটা কিছু—শুধু সেই মানুষটির চরিত্রের এক একটা দিক স্বভাবের আপন নিয়মে ধরা দিয়েছিল, আর কোনো বাহ্যিক বাহুল্যের অলঙ্কার তখনও সেই মানুষটিকে ঘিরে ফেল্‌তে পারেনি তখনও।

অবশ্য সুভাষের আই-সি-এস প্রত্যাখ্যানেই সবাই চম্‌কে উঠে তার দিকে চেয়ে দেখেছিল। কিন্তু তাই বলে শুধু এটাই তার দেশপ্রেমের একমাত্র উল্লেখযোগ্য নিদর্শন নয়, যার জোরে অকস্মাৎ সে রাতারাতি খ্যাতিমান হয়ে গেল। তার সৌম্য গম্ভীর, চিন্তাগভীর দৃষ্টির সামনে দাঁড়ালে শ্রদ্ধা আপনিই আসত।

এই সময়ে কত উন্নাসিক দাম্ভিকের দল আসত ছুটে, সুভাষকে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যত আজেবাজে প্রশ্ন করতে, তার মানে সুভাষকে মই দিয়ে স্বর্গে তুলে দেবে তারা—বলা বাহুল্য এদের অসার কথার জবাব দেবার মত তেমন কিছুই থাকত না। কত ছেলেকে দেখেছি মন দিয়ে পড়তে,—তারাও সুভাষের সঙ্গে দেশের সেবা করবে নিজের উন্নতি ক'রে। আবার এমন ছেলেও দেখেছি যে, একদিন হঠাৎ এসে জানালে সে প্রতিজ্ঞা করেছে সুভাষের আদেশ বহনের জন্য হাসপাতালের 'ডিউটি' ছেড়ে দিয়েছে। সুভাষ এই সব ছেলেদের জন্য বড় বিপন্ন বোধ করত। আমার কাছে এই ছেলেটির কথা শুনে সে দৌড়ে গেল সেই আদর্শবাদী ছেলেটির কাছে এবং অতিকষ্টে ছেলেটিকে এই সাংঘাতিক সঙ্কল্প থেকে বিনস্ত করলে। সুভাষের নিজেরই ভবিষ্যৎ তখনও অনিশ্চিত, এ অবস্থায় কি ক'রে অপরের ভাগ্য নির্দ্দেশ করবে সে? অনেক ক'রে মিষ্টকথা দিয়ে সুভাষ সেই ছেলেটিকে সাম্‌লালো, মাঝখান থেকে আমার পনের পাউণ্ড গচ্চা গেল। কারণ সেই পাগ্‌লা ছেলেটিকে হাসপাতালে প্রবেশিকা সেলামী দিতে হ'ল নতুন ক'রে এবং সে টাকাটা ধার করলে সে আমার কাছেই। বলা বাহুল্য যে সে টাকা আজও সে

শোধ করেনি—তাই বলে সে যে প্রচুর টাকা রোজগার করে না এমন নয়। আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে, এমন সব অমানুষও ত সুভাষের সিংহ গর্জন শুনে ঘেউ ঘেউ ক'রে ডেকে সাড়া দিয়েছিল। সেদিন সরকারী পদ প্রত্যাখ্যানের পর তাকে যে আকস্মিক বিপদে পড়তে হয়েছিল সেটুকু বলেই এবারে আমি ইংলণ্ডের কথা শেষ করব। সুভাষ যখন সরকারী কর্ত্তৃপক্ষের কাছে লিখিত ভাবে জানাল যে কোনো বৈদেশিক রাজ-তন্ত্রের অধীনে সে চাকুরী করতে পারবে না—(তখন সম্ভবতঃ লর্ড লিটন ছিলেন ভারতের আণ্ডার সেক্রেটারী) তিনি তাকে ডেকে পাঠিয়ে বৃথাই ফেরাবার চেষ্টা করলেন। তিনি বল্‌লেন, এ হঠকারিতা সে কেন করছে? কেন সে পদ প্রত্যাখ্যান করছে? সুভাষ আমায় সেই সাক্ষাৎকারের বিবরণ দেবার সময় বলেছিল—"আমি তাঁকে বল্‌লাম যে, আমার মনে হয় কোনো মানুষ একই সঙ্গে ব্রিটিশ রাজের অনুগত হয়ে ভারতবর্ষের সেবা করতে পারে না, তা সে যতই চেষ্টা করুক না কেন।"

এ খবর সুভাষের বাবার কাছে পৌছলো। যথারীতি তাঁর কাছ থেকে কেব্‌ল্ এল এবং তার পরেই এল সুভাষের এক দাদার সুদীর্ঘ পত্র। সে চিঠির সারমর্ম্ম এই যে, সুভাষের হঠকারিতায় তার বাবা খুব আঘাত পেয়েছেন, তাঁদের কোনো মতামতই না নিয়েই রোখের মাথায় এ কাজটা করা খুব খারাপ হয়েছে সুভাষের। অন্ততঃ সে ভারতবর্ষে ফিরে আসা পর্য্যন্ত চুপ ক'রে থাকতে পারত ত! তার জবাবে সুভাষ লিখলে যে, তার পক্ষে ইংলণ্ডের রাজার কাছে আনুগত্য এবং বশ্যতার শপথ নেওয়াই অসম্ভব; যে প্রতিজ্ঞা তার মনকে ভারাক্রান্ত ক'রে তোলে এমন সংকল্প মৌখিক ভাবেও সে গ্রহণ করতে পারে না। এর পর তার কোনো অগ্রজ আবার লিখলেন যে, সুভাষ তার পিতার পরমায়ু ক্ষয়ের কারণ হয়ে উঠেছে। তিনি সুভাষের জন্য দুশ্চিন্তায় ঘুমোতে পারেন না, তাঁর শুধু এই আশঙ্কা যে যে-মুহূর্ত্তে সুভাষ ভারত-বর্ষে পা দেবে অমনি তাকে বন্দী করবে ইংরাজ। রাজদ্রোহের বিষ ছড়াতে ছড়াতে সে যখন দেশে ফিরছে তখন কি আর রাজশক্তি ছেড়ে কথা কইবে!

আজও সেদিনের সুভাষের বিবর্ণ নিষ্প্রভ চেহারাটা আমি ভুলতে পারিনি—হাতে তার দাদার চিঠি। আমি খুব বিচলিত হয়েছিলাম, কিন্তু কীই বা বল্‌তে পারি?

অনেকক্ষণ চুপ ক'রেই কেটে যায়, অবশেষে বল্লাম—"এখন তুমি কি করবে?" "করব মানে?" সে অবাক হয়ে আমার পানে চাইলে—"অর্থাৎ তুমি কি বলতে চাও?" আমি ইতস্তত করি, শেষে বলি—"এখনও তুমি তোমার ইস্তফা নাকচ করতে পারো তো।" কথাগুলো যদিও আমার মনঃপূত নয়, তবু বল্লাম।

"এ কথা কি ক'রে বল্লে দিলীপ!" সে চটে গিয়ে জবাব দিলে।

আমি আমতা আমতা ক'রে বলি—"কিন্তু তোমার বাবা অসুস্থ লিখেছেন দাদা!"

"তা জানি।" কথাটা বলতে বলতে সুভাষের মুখ রাঙা হয়ে গেল—"কিন্তু আমাদের আদর্শ গঠনের মধ্যে পারিবারিক সুখ দুঃখের কথাই যদি একমাত্র চিন্তা হয়ে থাকে তবে সে আদর্শ হাস্যকর নয় কি? আমি আর কিছু ভাবি না, শুধু ভাবনা এই যে, বাবা ত এর পর আর এক পয়সাও পাঠাবেন না—যা বুঝতে পারছি। এখন দেশে ফিরি কি ক'রে?"

—"তুমি আমার কাছে একথা বললে কি ক'রে সুভাষ?" আমি ক্ষুণ্ণ হয়ে বলি—"আমি যে এখনও বেঁচে আছি একথাটা তুমি গ্রাহ্যই করতে চাও না যেন—আর আমার ত বাবা নেই যে, তিনি আমার স্বাধীন ইচ্ছার মাঝখানে প্রাচীর তুলে দাঁড়াবেন এসে।"

সুভাষ আমার কাছ থেকে নব্বই পাউণ্ড ধার নিলে—এ টাকা নিলে সে খুব কৃতজ্ঞ চিত্তে। কিন্তু তার চেয়ে আমি নিজেকে ঢের বেশি ধন্য মনে করেছিলাম বই কি। কয়েক সপ্তাহ পরে সে একদিন সকালে আমার কাছে এসে বল্লে যে, কর্ত্তৃপক্ষ 'সুভাষের সহায়ক মানুষটি'কে আবিষ্কার করেছে। অর্থাৎ তার এই দুঃসময়ে আর্থিকভাবে সাহায্য করেছে যে মানুষটি তার ভাগ্যেও কম দুঃখ জমা হচ্ছে না—একথাটা বলতে গিয়ে সুভাষ বিপন্ন হয়ে পড়ে। আমাকে এ ভাবে তার ভাগ্যের সঙ্গে জড়িত করায় তার এতটুকু সায় নেই। আমি অবিশ্যি কথাটা হেসেই উড়িয়ে দিই কিন্তু সে তা পারলে না। তার অন্তরের মাতৃত্বসুলভ করুণা আবার জেগেছে দেখতে পেলাম। তাতে যে আমিও অভিভূত হয়ে পড়লাম তা না বল্লেও চলে। এই ছোট ব্যাপারের পর জান্‌তে পারি যে ওটা গুজব। আসলে আমার ওপরে কেউ কেউ খুব ঈর্ষান্বিত হ'য়ে উঠেছে, আমার অপরাধ যে, তারা টের পাবার আগেই সুভাষকে টাকা দিয়েছি। অর্থাৎ তারা যদি এর বিন্দুবিসর্গও জান্‌তে পারত

তাহলে এ সৌভাগ্যটা আমার ভাগ্যে যেতে দিতনা। সুভাষকে আমি বল্লাম "দেখেছ উদারতা আর হিংসার বাস কি রকম পাশাপাশি।" সে শুধু হেসেছিল। সুভাষ আমার জন্য কতদূর দুর্ভাবনায় পড়েছিল সেইটা দেখাবার জন্যই আমি এই ঘটনার অবতারণা করেছি। তার এ ভাবনার মূলে ছিল বিবেকের তাগিদ। সে হয়ত এতটা দুশ্চিন্তায় পড়ত না যদি রাজনীতিক জীবন সম্বন্ধে আমার বিরূপতা তার না জানা থাকত। তার এই ধারণাই শেষ পর্য্যন্ত সত্য হল। আমি নিজে যদিও পারতপক্ষে তাকে আঘাত দিতে চাইতাম না কিন্তু আমার ক্রমবর্দ্ধমান রাজনীতির প্রতি বিরূপতা তার চোখকে ফাঁকি দিতে পারত না। বহুদিন পরে আবার Aldous Huxleyর 'Grey Eminence' বইতে দেখে আনন্দ হল যে আমার মত অনুভূতি তিনিও উপলব্ধি করেছেন, তিনি বলেছেন—"বার বার ধার্ম্মিক মানুষেরা রাজনীতির পথে এসেছেন এই আশায় যে রাজনীতিকে আপনার উন্নত আদর্শের মহনীয়তায় রূপান্তরিত করবেন, উন্নত করবেন। কিন্তু বার বার রাজনীতি তাঁদের নামিয়ে নিয়ে গেছে নিকৃষ্ট জীবনের মনোবৃত্তির পর্য্যায়ে—যেখানে রাজনীতিককে বাঁধা থাকতে হয় চিরকাল।"...কিন্তু রাজনীতি বা রাজনীতিক আমার বিষয়বস্তুর মধ্যে নয়, অতএব সে প্রসঙ্গ অবান্তর। শুধু এই কথা বলে দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌তে হয়, সুভাষকে দেখে যতই মুগ্ধ হয়েছি, যত বেশি তার গুণের প্রশংসা করেছি ততই মনে মনে ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা জানিয়েছি, সে যেন রাজনৈতিক অন্ধকার গহ্বর থেকে রক্ষা পায়।

কত বৎসর পরে, সে যখন কোণঠাসা হয়ে সংগ্রাম করছে তখনও আমি তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছি, রাজনীতি তার স্বধর্ম্ম নয়। কিন্তু সুভাষ সে কথা কিছুতেই মান্‌তে রাজি হয়নি। স্বপক্ষে যুক্তি তর্ক দেওয়া তার স্বভাব। যতই সে বুঝতে লাগল যে আমাদের স্বাধীনতা দলগত সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে সুদূরপরাহত ততই সে নিজের পরাজয়কে আত্মবলির চোখে দেখতে লাগল। সে একথাটা জান্‌ত না যে রাজনীতির ক্ষেত্রে আত্মবলির যথাযথ মূল্য মেলে না। সেখানে মানুষের নীচতাই পায় মর্য্যাদা। কিন্তু আর নয়, এবারে আবার বলি তার কথা যে মানুষটিকে আমি ভালবেসেছিলাম, যাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম, যার কাছ

থেকে পেয়েছি অনেক প্রেরণা—আমি তারই ছবি আঁকতে চাই, তাকেই জানাই আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি—রাজনীতিককে নয়।

সেই মানুষটি ছিল শ্রদ্ধেয়, তার প্রশংসার আছে অনেক দিক—তার সংকল্পের দৃঢ় সমুজ্জ্বল বলিষ্ঠ তরবারি বাধা পেলে ঘর্ষণে ঘর্ষণে জ্বলে উঠ্‌ত, তার আগুনের স্ফুলিঙ্গ পড়ত এদিক ওদিকে ঠিকরে, কিন্তু কখনই মাটির মত হারিয়ে ফেলত না নিজের স্বরূপকে। তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ তার জীবনের শেষ অভিযান—ইচ্ছাশক্তি কত বলশালী হ'লে মানুষ এমন অসম্ভব সংকল্পে নিজেকে ঠেলে দিতে পারে। হয়ত সে কখনও ভুল করেছে, হয়ত সে অনেকসময়ে তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধির পরিচয় দিতে পারেনি, কিন্তু মানুষ ছিল সে, একথা ত মিথ্যা নয়। মানুষের ভুল হয় বই কি। কিন্তু এসব বাদ দিয়ে যে স্বপ্নদর্শী দেশপ্রেমিকের দেখা পাই, যে দেশমাতৃকার ত্রাতার পরিচয় পাই সেই খাঁটি মানুষটির কথা ভুলব কি করে?

১৯৩৮ সাল শরৎ বাবুর উডবার্ণ পার্কের বাড়িতে আমরা দু'জনে পাশাপাশি রয়েছি। সুভাষ আমায় পণ্ডিচেরী সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা করছে, যোগ সম্বন্ধেও দু'চারটে প্রশ্ন করছে। যেন এসম্বন্ধে কিছু কৌতূহল দেখানোই তার উদ্দেশ্য। তাই আমি হঠাৎ চুপ করে যাই, তার পর বলি—"ব্যাপার কী বলো তো?"

—"কিছুই না।" ব'লে সুভাষ দৃষ্টি নত করে।

—"না, আমি বেশ বুঝতে পারছি তুমি আন্‌মনা হয়ে গেছ।"

কতকটা লজ্জিত ভাবেই সে কংগ্রেসের বড়কর্ত্তাদের কাণ্ড কারখানা সব খুলে বল্‌লে। যাকগে সে কথা আজ আর এখানে চাই না তুলতে। সব কথাই শুনলাম এবং শেষপর্য্যন্ত তাকে সে দিন আমি এতটুকু সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করি নি, কিছুমাত্র সহানুভূতিও দেখাই নি। শুধু সেই পুরাতন কথাটি যা এর আগে লক্ষবার বলেছি সেটা আর একবার বল্লাম—সে যে কংগ্রেসে গিয়ে সুবিধে করতে পারবে না এ কথা আমি কতবার বলেছি। তার চেয়ে ওসব ছেড়ে দিয়ে সে কেন রাজনীতির চেয়ে সারবান পথে আসছে না? এ নিয়ে সেদিন অনেক তর্ক হ'ল। আমি তাকে নানাভাবে চেষ্টা করেছি বোঝাবার।

"তুমি অনেক করেছ সুভাষ, আমাদের শাস্ত্রে বলেছে মানুষের ঋণ তিন রকমের, সে ঋণ অবশ্যই শোধ করা উচিত—পিতৃঋণ, ঋষিঋণ আর ঈশ্বরের কাছে ঋণ। তা তুমি তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ দিয়ে পারিবারিক খ্যাতি অর্জন ক'রে প্রথম কর্ত্তব্য পালন ক'রেছ—আজ তোমার পিতৃদেব তোমার নাম করতে গর্ব অনুভব করেন, এর চেয়ে আর বেশি কি হ'তে পারে। এখন আমার মনে হয় তোমার দ্বিতীয় কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সজাগ হওয়ার সময় এসেছে।"

"ঋষিঋণ?" বলে সুভাষ হাসলে। বুঝলাম এবারেও শর ব্যর্থ হয়েছে—এত কথা আমার অরণ্যে রোদনই হয়ে দাঁড়াল।

"অন্তত মনের শান্তি ত তোমার মিলবে।" কথা ক'টি ব'লে নীরবতার অস্বস্তি থেকে যেন পরিত্রাণ পেলাম।

—"শান্তি ?   কিন্তু দেশের কি হবে ?"

"সুভাষ, তোমার একথার উত্তরে আমার সেই মহাভারতের কথা মনে পড়ছে :

'কালেন সর্বম্ বিহিতম্ বিধাত্রা
প্রযায়-যোগেন লভতে মনুষ্যঃ।'

তুমি নিজেই ত চিত্তরঞ্জনের বিখ্যাত কথাগুলি প্রায়ই ব'লে থাকো, বিদেশী শোষণ-কারীদের চেয়ে আমাদের দেশের আপনার লোকেদের সঙ্গেই ঢের বেশী লড়াই করতে হয়। আমাদের দেশের মানুষ এখনও স্বাধীন হবার যোগ্য হতে পারে নি। তারা ত তেমন মর্ম্মে মর্ম্মে বোঝে না যে তারা ক্রীতদাস। ডেমোক্রেসী যাই বলুক না কেন জনসাধারণ কখনই বিচক্ষণ সমাজের মত তীব্রভাবে অনুভব করতে পারে না—তাদের সে মননশীলতা কোথায়! কিন্তু আমি চাই, তোমার জীবন সার্থক হয়ে উঠুক। তোমার স্বভাবের গভীরতম আহ্বানকে অবহেলা করছ কেন ? চলো আমার সঙ্গে পণ্ডিচেরী। যে মানুষ পারে জাতিগঠন করতে, ঋষিত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হবার যোগ্যতা যে মানুষের রয়েছে, তার কি তুচ্ছ একটা দল গড়ার বাজে কাজে সময় নষ্ট করা সাজে! তোমার এ দল অনন্তকাল চেষ্টা ক'রেও কি কিছু করতে পারবে ?"

আশ্চর্য্য—কথাটা সুভাষের মনে সাড়া পেয়েছিল। আশা করি নি তা।

—"দিলীপ, আমি জানি তা। কিন্তু আজ যদি 'যোগ' করতে যাই তাহলে জীবনের মত পরাজয় স্বীকার ক'রে যেতে হবে!" বলতে বলতে তার ওষ্ঠ কেঁপে গেল, দৃষ্টি দীপ্ত, উজ্জ্বল, ভাস্বর হয়ে উঠল।

—"কিন্তু তুমি ত পরাস্ত নও। আজ তোমায় বাংলার যুবসমাজ আদর্শ ব'লে স্বীকার করে। কিন্তু এর পর যদি চলো এমনি ক'রেই—পথের শেষে সঙ্গিবিহীন, কঠিন একাকীত্ব ছাড়া আর কিছুই পাবে না। সময়ের আশায় মানুষকে সবুর করতেই হয় সুভাষ। আচ্ছা ধরো যদি তুমি রাজনীতির রাস্তা ছাড়তে না-চাও তাহলে নয় কিছুদিনের জন্যই আমার সঙ্গে চলো, ঘুরে আসবে। হয় ত তাতে তোমার দৃষ্টি স্বচ্ছতর হবে, পথের দিশা দেখতে পাবে।"

কয়েক মুহূর্ত্ত ভেবে সে ঘাড় নেড়ে বল্‌লে—"না, দিলীপ, তাও সম্ভব নয়—"

—"কেন, জানতে পারি কি ?"

—"কারণ, আমার মনে হচ্ছে, যদি সাময়িকভাবেও তোমার সঙ্গে নিভৃতবাসে যাই তাহলে কি জানি হয়ত আমার মনের এ অগ্নি ঠিক এমনি থাকবে না—হয়ত যুদ্ধের স্পৃহা হারিয়ে যাবে।"

সেদিন নূতন ক'রে তার জীবনের বেদনা আমার অন্তরকে নাড়া দিয়েছিল। এ যেন তার জীবন সম্বন্ধে জ্ঞানের নূতন আলোকসম্পাত হ'ল,—গভীরতর সুরের আভাষ পেলাম আমি। সে চায় নি শান্তি, চায় নি সত্য দৃষ্টির স্বচ্ছতা, তার কারণ সে সমস্ত সত্তা দিয়ে ভালোবেসেছিল দেশকে। যদিও আমি দেশের কাজকে সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ বলে মনে করি নি কখনই তবু সেদিন সুভাষকে শ্রদ্ধা না ক'রে পারিনি। আমাদের দেশের দুঃস্থ, শোষিত দরিদ্র মানবাত্মার প্রতি তার অকৃত্রিম মমত্ববোধ সত্যিই মহান্। ভারতবর্ষকে সে ভালবাসত। তাই যখন পিতৃদেবের 'ভারতবর্ষ' গানখানি গাইতাম তার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠত:

"যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননি! ভারতবর্ষ!
উঠিল বিশ্বে সে কি কলরব, সে কি মা ভক্তি, সে কি মা হর্ষ!
যেদিন তোমার প্রভায় ধরার প্রভাত হইল গভীর রাত্রি,—
বন্দিল সবে, 'জয় মা জননি! জগত্তারিণি! জগদ্ধাত্রি!'
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ কমল করিয়া স্পর্শ;
গাইল, 'জয় মা জগন্মোহিনি! জগজ্জননি! ভারতবর্ষ!'

* * *

জননি, তোমার বক্ষে শান্তি, কণ্ঠে তোমার অভয়-উক্তি,
হস্তে তোমার বিতর অন্ন, চরণে তোমার বিতর মুক্তি;
জননি তোমার সন্তান তরে কত না বেদনা, কত না হর্ষ,
জগৎ-পালিনি! জগত্তারিণি, জগজ্জননি! ভারতবর্ষ।"

ভারতের তমসাবৃতা দুঃখরাত্রির চিন্তায় বেদনায় গাঢ় হয়ে উঠতো তার মুখ। অজানার প্রতি এই আকর্ষণ, এ ত শুধু দেশ-কর্ম্মীর নয়। দু'বছর আগে তার একটা লেখা হঠাৎ আমার নজরে পড়ে: "সবাই যে পথে যায়, সে পথে নয়; অজানার সন্ধানে বেরিয়ে-পড়া দুঃসাহসিক অভিযাত্রীর জীবনই আমাকে বারবার আকর্ষণ

করে। এই জীবনে হয়ত দুঃখ আছে, কিন্তু আনন্দও আছে; অন্ধকার রাত্রি যেমন সত্য, প্রদোষের অরুণালোকও তেমনই সত্য। আমি এই পথেই আমার দেশবাসীকে আহ্বান করছি।" (২৩—২—৩৮, বিঠলনগর) আমি বলব এ আহ্বান দেশকর্ম্মীর আহ্বান নয়, এ সেই মিষ্টিক,—সেই রহস্যসন্ধানী ভাবপ্রবণ মানুষটির ডাক।

আমি তার মধ্যে এই ভাবপ্রবণ রহস্যসন্ধানী মনটির পরিচয় পেয়েছিলাম—আমি জানি এই দুর্জ্ঞেয়ের সন্ধানই তার জীবনের আসল ব্রত ছিল; তাই আজ মনের কন্দর খুঁজে তার সম্বন্ধে এত কথা আমি বলতে বসেছি। যদিও এই ভাববাদী মনটিকে সে কখনও প্রশ্রয় দেয়নি, তবু আমি জানি, এই 'ক্ষুদ্রের' পিছনে সে তার সব কিছু বিলিয়ে দিত না, যদি না সে জানত এই দেশের কাজই তাকে চরম লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে। সেইজন্য ভারতবর্ষ তার কাছে মাটির দেশ ছিল না, ভারতবর্ষ ছিল ভারতমাতা। রক্তমাংসের মানবী মা-য়ের মতই এই দেশমাতৃকা তার সন্তানদের জন্য অশ্রুবিসর্জ্জন করেন—দেশমাতৃকার ক্রন্দনের মধ্য দিয়ে সুভাষ শুনতে পেত পরমাত্মার ডাক। তার মধ্যে এই ভাবপ্রবণ মানুষটি যদি না থাকত তাহলে আমি জোর করেই বলতে পারি, তার এই ব্যক্তিত্বের প্রভাব তার পরিচিতদের আচ্ছন্ন করে ফেলতে পারত না। শুধু তার ব্যক্তিগত বন্ধুদের কথাই আমি বলছি না। জীবন-যুদ্ধে বঞ্চিত আর হতভাগ্য যারা তার কাছে আসত, সবাই তার এই দিকটা অনুভব করেছে। সাধারণতঃ যাঁরা মহত্ত্বের দাবী রাখেন তাঁরা অন্তরের এই আবেগটাকে চাপা দিয়েই চলেছেন, কিন্তু রহস্য-সন্ধানী ভাববাদীর পক্ষে এই আবেগ তাঁর ব্যক্তিগত গণ্ডী ডিঙিয়ে তাঁর চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে। সুভাষের প্রিয় মরমী কবী এ, ঈ, বলতেন:

মনের দীপণ জ্বলবে যখন
আপন ঘুমের ঘোর টুটিয়ে
রাঙিয়ে দেবে বিশ্ব-রঙীন
অরুণ আলোর ফুল ফুটিয়ে।

শুধু যে জগতের বঞ্চিত আর হতভাগ্যের দলই তার এই সমবেদনশীল মনের ছোঁয়াচ পেত তাই নয়। অবিশ্বাসীর বিদ্রূপে যখন কেউ সাহস হারিয়ে

ফেল্‌ত তখনই তার কাছে শক্তি আর প্রেরণা নিয়ে এগিয়ে যেত সুভাষ। তার চরিত্রের এই বিশেষ শক্তি সম্বন্ধে আমি একটা ঘটনার উল্লেখ করছি।

আমি আগেই বলেছি যে, সুভাষ 'স্বর্গজাত চাকরী' থেকে ইস্তফা দেবে মনস্থ করার পর, আমি ও আর কয়জন বন্ধু আই, সি, এস্ (সুভাষ আই, সি, এস্-এর চাকরীকে ঠাট্টা করে বলত 'স্বর্গজাত চাকরী') পরীক্ষা আর দিই নি। আমি আবার আইন পড়াও ছেড়ে দিলাম। তারপর অঙ্কশাস্ত্রে ট্রাইপোজ-এরও প্রথম পরীক্ষায় পাশ করার পর শেষ পর্য্যন্ত দ্বিতীয় পরীক্ষাটা আর দিলাম না। আইনটা ছেড়ে আমি যেন বরং খানিকটা স্বস্তিই অনুভব করলাম, কিন্তু অঙ্কটা ছাড়তে আমার বেশ কষ্ট হয়েছিল মনে পড়ে, কারণ আমার মনে মনে তখনও "ব্যাঙ্কার" হবার একটা অভিলাষ উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল। এ ধরণের আকাঙ্ক্ষা বা উচ্চাশা অবশ্য মূঢ়তা ছাড়া আর কিছুই নয়; আজ সেটা বেশ বুঝতে পারি; কিন্তু সেদিন ত এ বিশ্বাস ছিল না। যাক্ সে কথা, আমার এবার ডাক পড়্‌ল সঙ্গীতে। আমাদের এক আদর্শবাদী বন্ধু (৺শরৎ দত্ত, ইনি জার্ম্মাণীতে ইঞ্জিনীয়ার হিসাবে বেশ নাম করেছিলেন) আমাকে বলত—'সুভাষের মত তুমিও ও রাস্তা ছেড়ে দাও।' শেষ পর্য্যন্ত তাই হলো। আমি ভাবলাম নিজে যদি নিশ্চিন্ত আরামের জীবন গড়ে তুল্‌তে চাই, তাহলে সুভাষকে আর আমার বন্ধু বলার ত অধিকার থাকবে না। কেম্‌ব্রিজেই সঙ্গীতশাস্ত্রের গোড়াপত্তন করে নিই ঠিক করে—বিশেষ-সঙ্গীত বিষয়টা (Special-music) নিয়ে নিলাম। কিন্তু সঙ্গীত শাস্ত্রের তত্ত্ব কথায় আমি রস পাই নি। কোথায় আমি ভেবেছিলাম —সুরের মূর্চ্ছনায় অতীন্দ্রিয় এক আনন্দলোকের সন্ধান করবো, তা নয় নীরস তত্ত্ব কথা। যা হবার তাই হলো—'সঙ্গীত'-এ প্রথম পরীক্ষায় পাশ করলাম বটে, কিন্তু দ্বিতীয়টা আর হয়ে উঠলো না। এতে দমে যাবার কথা বই কি। কিন্তু এর জন্যে ষোলআনা দোষ ছিল আমারই; অর্কেষ্ট্রা, অপেরা পার্টী আর শুধু গান শুনেই এ রকম একটা কঠিন পরীক্ষায় কখনও পাশ করা যায় না। শেষ পর্য্যন্ত ডিগ্রী না নিয়েই কেম্‌ব্রিজ ছাড়বো ঠিক করলাম।

খবর শুনে দেশে আমার আত্মীয় স্বজন বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। তাঁদের আর দোষ কি, কারণ গোঁয়ার হলেও, আমি নিজেকে যা মনে করতাম

তা যে আমি নই সেটুকু বোঝার মত বুদ্ধি কেবলমাত্র আমারই ছিল। আমার যে গুণ ছিল, ক্ষমতা ছিল, সে কথা আমার শত্রুরাও স্বীকার করবেন; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে যে পথে আমি মানুষ হচ্ছিলাম, সে পথে হয়ত কৃতকার্য্য হব না এই ভেবে আমার শত্রুরা বেশ আনন্দই পেয়েছিলেন।

যাই হোক্, দেশের আত্মীয়স্বজনরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে অনুরোধ করলেন—আমি যেন ট্রাইপোজটা ছেড়ে না দিই। তাঁরা তারযোগে বারবার চীৎকার করে উঠলেন—"পুরোদস্তর সাহেব যদি নাও হতে পার, তাহলে নিদেন ছোট-খাট একটা প্রফেসার যেন হয়ে এস।" তাঁদের কী করুণ আকুতি।

কিন্তু আমি সব কিছু ছেড়ে দেবার জন্য আকুল হয়ে উঠেছিলাম। বিদ্রোহী সুভাষকে ভালবেসে ফেলার পর দত্ত বলত 'অনিশ্চিতে ঝাঁপিয়ে পড়ার দুঃসাহসিক অদূরদৃষ্টির উদাহরণ দিয়েছে সুভাষ।' সুভাষকে অনুসরণ করতে গেলে সব কিছু আমাকে ছাড়তেই হবে—মনকে বোঝাতাম আমি। সুভাষ আর আমি তার লণ্ডনের গোল্ডার্স গ্রীণ ফ্ল্যাটেই থাকতাম। সাহসী আর প্রাণোচ্ছ্বল স্বভাবের জন্য সুভাষ তাকে খুব শ্রদ্ধা করত। সুভাষের শ্রদ্ধার মান রেখেছিল দত্ত। প্রথম মহাযুদ্ধে জার্ম্মাণীতে বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকের সম্মান সে পেয়েছিল। দত্তকে সুভাষ সত্যিই খুব শ্রদ্ধা করত, আর দত্তও সুভাষকে ভালবাসত প্রাণ দিয়ে। দত্ত আমার গান শুনতেও খুব ভালবাসত—আমাকে ত উৎসাহ দিত সে-ই। কিন্তু দেশে আর ইংলণ্ডে আমার বন্ধু আর আত্মীয়স্বজনের অনুরোধ-উপরোধের বোঝা ঝেড়ে ফেলা আমার একার পক্ষে রীতিমত কঠিন হয়ে উঠছিল। তারা যে বলে—'আমার নাকি মতের ঠিক নেই'—সত্যিই যদি তাই হয়, তবে? তা ছাড়া আমি যে সব সময়েই দোলাচল-চিত্ত—এ ত আর মিছে কথা নয়।—সুভাষের মত হওয়া আমার পক্ষে দুরাশা, কারণ ও হলো অন্য ধাতে তৈরী, আমার সঙ্গে ওর মিল কতটুকুই বা। আমার সাবধানী উপদেষ্টারা সবাই মিলিত কণ্ঠে এই সব বলে আমাকে বোঝাতে লাগলেন।

কিছু ঠিক করতে না পেরে সংশয় নিয়েই শেষ পর্য্যন্ত সুভাষের শরণ নিলাম, বল্লাম—"এখন একটা কিছু ঠিক করতেই হবে আমাকে সুভাষ,—মানে,

আমার অবস্থাটা ত বুঝতে পারছ তুমি! কী আমার করা উচিত, তুমি বলে দাও সুভাষ।"

সে কথাটা যেন এড়িয়ে গিয়েই বলল—

"কিন্তু, দিলীপ, আমি ত গানবাজনা সম্বন্ধে কিছু বুঝি না।"

আমার মনে বেশ আঘাত লাগল এই কথাটায়।

বল্‌লাম—"দেখো ভাই সুভাষ, আমি ত আর তোমাকে গানের সুর-রাগ সম্বন্ধে কোন উপদেশ দিতে বলিনি। জানতে চাইছি—আমার বর্ত্তমান আদর্শ সম্বন্ধে তোমার মতামত কী? আমি ভাবছি সঙ্গীতকেই আমার ব্রত বলে গ্রহণ করবো, তোমার মত আর সব কিছুই আমি ছেড়ে দিতে চাই। কিন্তু তুমি হলে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ লোক, আর আমার মতের কোন স্থিরতা নেই—জানোই ত লোকে আমাকে কি বলে। আমি এ বিষয়ে তোমার সত্যকার মতামত জান্‌তে চাই।"

সুভাষ আমার কাঁধের উপর একটা হাত রেখে আন্তরিকভাবেই বল্‌ল—"দিলীপ, আমাকে ভুল বুঝো না তুমি। তুমি বেশ ভাল করেই জানো—যারা আদর্শবাদের নিন্দা করে, তাদের সঙ্গে আমার মতের এতটুকুও মিল নেই।"

আমি খানিকটা উৎসাহিত হয়ে বল্‌লাম—"ঠিকই ত। তুমিই ত সেদিন বলেছিলে যে জীবনে আদর্শ আর দুঃসাহসিকতা নেই, সে জীবন জীবনই নয়।"

"সে কথা আমি মিথ্যে বলিনি, আমি সত্যিই তা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি।" আবার তার মধ্যে যেন সেই স্বপ্নাশ্রয়ী মানুষটি জেগে উঠলো।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে সে আবার বলল—"দেখো দিলীপ, তোমার ওপরে আমার অনেক আশা আছে সে কথা ত তুমি জান। সেই জন্যই আমি বারবার তোমাকে বলেছি, আজেবাজে সময় নষ্ট করো না।"

"কিন্তু বাইরে থেকে যা দেখা যায়, সব সময় ঠিক তাই ত নয়—"।

সুভাষ আমার কথা থামিয়ে বলে উঠল।—"শোনো, তুমি বেশ ভাল করেই জান মনস্তত্ত্বের খুঁটিনাটি সম্বন্ধে জানবার আমার কোন ধৈর্য্য নেই, আমি জানি যে আমি হৈ চৈ ক'রে আমোদ প্রমোদ ক'রে বেড়াই না বলে অনেকে কিছুটা হতাশ হয়েছে আমার সম্বন্ধে। কিন্তু সঙ্গীত সম্বন্ধে

আমি যদিও বিশেষ কিছু বুঝি না, তবু আমার বিশ্বাস ওটা ঠিক ছেলেখেলার জিনিষ নয়। তোমার সংস্পর্শে এসেই আমি জেনেছি এর একটা বিশেষ দিক আছে। এর পিছনে একটা মহৎ উদ্দেশ্য আছে। যদি তুমি আন্তরিকভাবে বিষয়টিকে গ্রহণ করো, তাহলে আমার সমর্থন সব সময়েই তুমি পাবে। কিন্তু একটা কথা—এর মধ্যে দ্বিধা করলে চলবে না—একাগ্র হতে হবে। তাহলেই তোমার নিন্দুকদের মুখ বন্ধ হবে। 'সব সময়েই একটা দুঃসাহসিক ঔদ্ধত্য'—ডাণ্টনের এই কথাটা আমার খুব ভাল লাগে। চিরাচরিত পথ আমি সব সময়েই ঘৃণা করি। যারা তোমায় বাধা দেয়, বলে যে সঙ্গীত থেকে জীবনে উন্নতির কোন আশা নেই—তাদের কথায় আমি মোটেই বিচলিত হই না। কারণ, এর অর্থ এই যে, সঙ্গীতকে আন্তরিকভাবে কেউ গ্রহণ করে নি। মনে রেখো, সঙ্গীত তোমাকে আধ্যাত্মিক বিষয়ে কতটা সাহায্য করতে পারবে, সে বিষয়ে আমি কিছু জানি না। কিন্তু একথা আমি আন্তরিক ভাবেই বলছি—যখন তোমার পরামর্শদাতারা মাথা নেড়ে বলেন—গান! ওতে কি আর পেট ভরবে? তখন আমার রাগে সর্ব্বশরীর জ্বালা করতে থাকে। আমরা কি বিলেতে আস্‌ব শুধু কেরাণী আর আমলা তৈরী হবার জন্য? না তা হতে পারে না। তোমার আদর্শে আমার পূর্ণ সমর্থন আছে—আমি অনুভব করি সঙ্গীতের পিছনে একটা আদর্শ আছে।"

আমার দ্বিধা-দ্বন্দ্বের নিরসন হ'ল। এবার গলা সাধবার জন্যে জার্ম্মাণী চলে গেলাম। কিন্তু সে ত অন্য প্রসঙ্গ। সুভাষের কথায় ফিরে আসা যাক্।

এতক্ষণ এই যে ঘটনাটার কথা বল্‌লাম তা শুধু সুভাষের ব্যক্তিত্বের একটা দিকের পরিচয় দেবার জন্য। বাইরের পরিবেশ থেকে আমরা যে টুকু পাই তার পরিমাপ করা সহজসাধ্য নয়, কারণ বাইরের শক্তিটুকুকেও আমরা নিজের বলে আত্মসাৎ করে দিতেই চাই। তার কারণ আমরা সবাই একটু বেশী পরিমাণে 'আত্মবিশ্বাসী'। সেই জন্যেই পৃথিবীতে অকৃতজ্ঞতা এত বেশী। কিন্তু তা সত্ত্বেও, অদূরে একটা দুর্গ প্রাসাদ দেখলে সকলের মনেই একটা শক্তির সঞ্চার হয়। অনেকের কাছেই সুভাষ ছিল এই রকম একটা শক্তির উৎস। সুভাষে কথা ভাবলেই আমার মনে পড়ত চেষ্টারটনের একটি কবিতা:

ঘুণধরা জীবনের
বিষণ্ন বাতাসে ভরা
এক ঘেয়ে সুখ আর
ক্লান্তিকর সম্পদের ধারা।
ক্ষণজীবী ডানা-মেলে উড়ে যাওয়া
প্রেমের স্বপন ছাওয়া
শত শত ম্লান বাসনার স্তূপ।
তার মাঝে যদি কোনো
অগ্নিময় ধ্রুব সংকল্পের বাণী
জাগিয়া জাগিয়া কাঁদে—
ব্যথাইয়া তোলে জীবনের মর্ম্মমূল
সে নহে তভুল
—সে জীবন,
সে বেদন,
সার্থক—অপরূপ।

সত্যিই তাই নয় কি? জীবনে আমরা অনেক শিল্পীর দেখা পাই, অনেক বৈজ্ঞানিকও আমাদের সংস্পর্শে আসেন; কিন্তু যখন মানুষ এইরূপ একটি ব্যক্তির সামনে এসে পড়ে, যে একটি অদম্য ইচ্ছার ওপর তার জীবনের বিরাট সৌধ গড়ে তুলতে চায়, তখন মানুষ শ্রদ্ধায় হতবাক্ হয়ে যায়। মনে হয় সে যেন পরিপূর্ণ হয়ে গেছে, সে যেন কৃতজ্ঞ অনুভব করে সেই ব্যক্তিটির প্রতি। উন্নাসিক অবিশ্বাসীরা আমাদের শুধু দ্বিধাবিক্ষত ভীতিগ্রস্ত করে তোলে—আমরা এর একটা বিপরীত শক্তি খুঁজে বেড়াই। অন্ততঃ আমার কাছে সুভাষ ছিল এইরকম একটা শক্তি; সে যেন দুঃসাহসিক হবার একটা প্রেরণা, সব কিছু উড়িয়ে দেবার একটা ঔদ্ধত্যের প্রতীক। তরঙ্গবিক্ষুব্ধ জীবনসমুদ্রে এরূপ আলোকস্তম্ভ সবসময় পাওয়া যায় না; আমরা তাকে শ্রদ্ধা করতাম কারণ সে ছিল আমাদের কাছে এই আলোকস্তম্ভ।

১৪

এতক্ষণ যা বললাম তাতে হয়ত সুভাষের উপর অবিচার করা হয়ে পড়লো। আমি তার 'সীরিয়াস্' দিকটার উপর এত জোর দেওয়ায় যাঁরা তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশার সুযোগ পাননি, তাঁরা হয়ত মনে করতে পারেন তার মধ্যে হাস্যরস বা অনাবিল আনন্দ বলে কিছু ছিলনা। একথা সত্যি যদি কেউ ভেবে থাকেন তাহলে খুব ভুল হবে। আনন্দ অনুভব করবার শক্তি তার সত্যিই যথেষ্ট ছিল একথা আমি আগেও বলেছি। অনেক বছর পরে সে একটা জনসভায় বলেছিল, সৌন্দর্য্য, আনন্দ আর রসবোধ তার মধ্যে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল, তার অজ্ঞান্তেই। আমি এটা ঠিক বিশ্বাস করি না। 'সীরিয়াস্' ভাবটা তার মধ্যে প্রখর হলেও, অনাবিল হাসি ঠাট্টা আর আনন্দের মধ্যে সে ছেলেমানুষের মত খুসী হয়ে উঠতো। একমাত্র যখন 'কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের' সঙ্গে তার মনোমালিন্য হয়, সেই সময়টা ছাড়া, সারা জীবনই সে প্রাণপ্রাচুর্য্যে আর সরল আনন্দে উচ্ছল হয়ে থাকতো। কিন্তু সেই সময়েও তার সেই শিশুর মত সরলতা একেবারে অবলুপ্ত হয়ে যায় নি—তখনও সে যে ঠাট্টা বিদ্রূপে হো হো করে প্রাণখোলা হাসি হেসে উঠতে পারত; তার সহকর্ম্মী ও বন্ধুরা আশ্চর্য্য হয়ে যেত। অন্তরের জ্বালাকে সংযত করে রাখার মত শুধু অভিজাত-সুলভ আত্মসংযম থেকে এ ধরণের প্রাণখোলা হাসি কেউ হাসতে পারে না। হাস্যপ্রিয়তা না থাকলে এ অসম্ভব সম্ভব হতে পারে না। সেই সভাতেই সুভাষ বলেছিল 'দিলীপের প্রাণখোলা হাসি থেকে অনুপ্রেরণা না পেলে' তার হাস্যপ্রিয়তা হয়ত নষ্ট হয়ে যেত। সুভাষ আমার সম্বন্ধে খানিকটা বাড়িয়ে বলেছিল। আমি শুধু গভীর কর্ম্মমগ্নতা থেকে তার আসল সত্বাটীকে বার করে এনে দিয়েছিলাম—তার পর স্বাভাবিক আনন্দময় মনটা গানে আর হাসিতে সহজ গতিতেই এগিয়ে গিয়েছিল। আমি মাঝে মাঝে প্রায় জোর করেই ডাণ্টন, গিবন্স আর ম্যাট্‌সিনির গভীর চিন্তারাজ্য থেকে উদ্ধার করে শরৎ দত্ত, শরৎ চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণপ্রেম, গগনবিহারী মেহতাদের মত স্বচ্ছ হাস্য রসিকের সংস্পর্শে নিয়ে আসতাম। তার ফলও ঠিকই হয়েছিল। দত্তর ঠাট্টা বিদ্রূপ আর হাসির কথায় সে একবার হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়েছিল যদিও তখন পারিবারিক কারণে তার মন মোটেই ভাল ছিল না। দত্ত-র হাস্যরসের দু'একটা উদাহরণ দিচ্ছি।

দত্ত-র একটি ছেলে ছিল—তার বুদ্ধির বালাই বলতে কিছু ছিল না। তার সম্বন্ধে কিছু বলতে হলেই দত্ত শেষ পর্য্যন্ত বলত "সব বাবাই বলে, তার ছেলেগুলি দারুণ বুদ্ধিমান, তাই আমি ভাবছি, পৃথিবীতে যে নির্বোধ ইডিয়টগুলো গিজ্‌গিজ্‌ করছে, সেগুলো এলো কোথা থেকে ?—অবশ্য আমার রত্নটিকে আমি বাদ দিচ্ছি না।" দত্ত যখন এ রকম মজার মজার কথা বলত, আমরা সবাই হো-হো করে হেসে উঠতাম, সুভাষও আমাদের হাসিতে যোগ দিত প্রাণখোলা ভাবেই। এইরকম একটু বুদ্ধির মারপ্যাঁচে প্রাণখোলা ভাবে হাসতে পেরে তার যেন অনেকটা ভার লাঘব হয়ে যেত, মুখটা বেশ নিশ্চিন্ত খুসী খুসী হয়ে উঠত। ছোটবেলা থেকেই তাকে যে পরিবারের মধ্যে মানুষ হতে হয়েছিল তার ফলেই বোধ হয় এরকম হ'ত। 'সিরিয়াস্' হওয়াটা যেন তার মজ্জাগত ছিল। সেই জন্যেই আমরা যারা প্রায় সব সময়েই হাসি খুসিতে থাকতাম, তাদের চেয়েও তার পক্ষে হাসির প্রয়োজন ছিল বেশী—তাই সে দত্ত-র ছোটখাট কথায় গড়িয়ে পড়ত। আর এক দিনের কথা মনে পড়ছে। দত্ত একদিন আমাদের বল্‌ল—সে গান এত ভালবাসে যে মাঝে তার নিজের গাইতে সখ হয়। "কিন্তু"—করুণভাবে সে গানের সুরে বল্‌ল :

'গানে সবায় করব খুসী এইত আমি চাই,
কিন্তু ভায়া গাইলে পরে,
নিজেই এখন কাঁপি ডরে।
হয়ত তোমরা ফেলবে কেঁদে, এইত বাধা ভাই।'

শুনে সুভাষের সে কি হাসি ! হাসতে হাসতে কোমরে তার ব্যথা ধরে গেল,—শেষ পর্য্যন্ত দম বন্ধ হয়ে যায় আর কি। তার প্রাণখোলা হো—হো করে হাসি—শিশুর মত উচ্ছল—সে কেউ ভুলতে পারবে না। কয়েক বছর পরের আর একটি ঘটনার কথা বলছি—সে বোধ হয় ১৯৩৮ সালে। ঘটনাটি ঘটেছিল আমাদের থিয়েটার রোডের বাড়ীতে—ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সেদিন-কার বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। সুভাষকে বেশ ক্লান্ত আর পরিশ্রান্ত দেখাচ্ছিল—সে তখন বাংলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি। সুভাষ, শরৎচন্দ্র, আর সুভাষের বন্ধু আর কয়েকজনকে আমিই ডাকিয়েছিলাম—তাকে একটু একটানা আড্ডা আর আনন্দের মধ্য দিয়ে তাজা করে তোলার জন্যে। এই ধরণের আড্ডার

আয়োজন মাঝে মাঝে আমি সুভাষের জন্যই করতাম—এসব আড্ডায় গানের ব্যবস্থাও থাকত। এবারকার আড্ডাটা কিন্তু সে রকমের ছিলনা—শুধু বিখ্যাত ঔপন্যাসিকটির প্রযোজনায় নিছক গালগল্পের মজলিশ। শরৎচন্দ্র নিজে খুব মজলিসী লোক ছিলেন। সুভাষ তাঁর গল্প শুনতে খুব ভালবাসত—বলত এমন একটা আড্ডাবাজ লোক সত্যিই দুর্লভ।

দিনটা আমার স্পষ্ট মনে পড়ছে—যেন কালকার ঘটনা।

গল্পটা সুরু হলো খদ্দর নিয়ে—শরৎচন্দ্র প্রথম প্রথম একজন উগ্র উৎসাহী ছিলেন এ বিষয়ে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত নিরাশ হয়ে তখন একেবারে ছেড়ে দিয়েছেন। সুভাষ জিজ্ঞাসা করলো—ব্যাপার কী দাদা? এত উৎসাহ আপনার, শেষ পর্য্যন্ত সব ছেড়ে দিলেন যে?

শরৎচন্দ্র গম্ভীর ভাবে বললেন—'ব্যাপারটা খুব খারাপ ভায়া, বাড়িতে আর ঝি চাকর থাকতে চায় না। তারা বলে আমার কাপড় গুলো বালতীর জলে একবার ডোবানো যায় বটে, কিন্তু তার পর আর টেনে তোলা যায় না।"

হাসির জের একটু কমে আস্‌লে আমি বল্‌লাম "চলো সুভাষ, গঙ্গার উপর দিয়ে একটু ষ্টীমার ভ্রমণ করে আসা যাক্—চমৎকার লাগবে—তা ছাড়া তোমার একটু হাওয়া বদলও দরকার।"

সুভাষ শরৎচন্দ্রের দিকে সকৌতুকে তাকিয়ে বললে "উনি যদি বাংলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতির পদ থেকে আমাকে মুক্তি দিতে রাজী হন—তা হলে আমি রাজী—নইলে অসম্ভব।"

শরৎচন্দ্র তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বিশেষ স্বরে বললেন, "দেখো সুভাষ, আমাকে যতটা বোকা দেখায় বাইরে থেকে, ততটা বোকা আমি নই। হ্যাঁ, শেষ পর্য্যন্ত কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, তা কি আর আমি জানি না ভেবেছ?"

"তার মানে?"

—"মানেটা হচ্ছে, সোজা—ওরা আমাকে হাতকড়া লাগিয়ে টেনে নিয়ে যাবে, ভগবানও জানেন না কোথায় ব্যাটারা কোন চুলোয় লুকিয়ে রাখ্‌বে—আর তোমরা বেশ তারপরে 'বন্দেমাতরম্' বলে চেঁচাবে আর বড় জোর হয়ত দুটো ফুল ছিটোবে, তাও আমার পিছনে। কিন্তু এতে কি আর এক বছরের জেলের কষ্ট

পোষায় হে?—তার ওপর আবার শুনেছি জেলের মধ্যে আবগারী একেবারে প্রবেশ নিষেধ।" (শরৎচন্দ্র বর্ম্মায় থাকতে আফিম ধরেছিলেন) শুনে সুভাষের সে কী হো—হো করে হাসি—হাসির দমক আর থামতেই চায় না তার—প্রাণখোলা সরল উদার হাসি তার। কিন্তু এবার অন্য বিষয়ে ফিরে আসা যাক্।

১৫

১৯২১ সালে ইংলণ্ড থেকে ফেরার পর সুভাষ দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ল—(সে তখন চিত্তরঞ্জন দাশের একান্ত অনুরক্ত) সুরু হলো তার জয়যাত্রা। কাগজে পড়লাম, বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজের সে অধ্যক্ষ নিযুক্ত হলো—তা ছাড়া বাংলা কংগ্রেস কমিটির প্রচার বিভাগের ভার নিলে সে। তারপর সে ন্যাশনাল ভলাণ্টিয়ার বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত হলো—এ কাজটা তার খুব পছন্দ মত হয়েছিল। কিন্তু এভাবে বেশী দিন চলেনা—সেই বছরই ডিসেম্বর মাসে তার প্রিয়তম নেতার সঙ্গে সে-ও গ্রেফ্‌তার হল—ছয়মাসের জেল।

তার জন্য আমার কষ্ট হল বটে—কিন্তু গর্ব্বও অনুভব করলাম বই কি। যখন সে ছাড়া পেল তখনও আমি বার্লিনে—সঙ্গীতের বিবিধ কায়দাগুলো আয়ত্ত করছি—গলাসাধা, ভায়োলিন বাজানো আর ইটালীয় ঢঙে ইউরোপীয় গান শেখা। সুভাষ মাঝে মাঝে চিঠি লিখ্‌তো আমাকে—কিন্তু বড় চিঠি কখনই সে লিখত না—অত সময়ই বা তার কোথা?—কিন্তু সেই ছোট্ট চিঠি গুলোতেও তার প্রাণপ্রাচুর্য্য, নৈতিক শক্তি, আর উদার স্নেহপ্রবণ মনটার ছাপ রয়ে যেত সুগভীর। আমি তার জন্য হয়ত ছোট খাট কী একটা কাজ করেছি—তার কথা লিখতে কখনই তার ভুল হ'ত না। ১৯৩২ সালে সেপ্টেম্বর মাসে, একটা চিঠির উত্তরে সে যা লিখেছিল তা বলছি—এর থেকে বোঝা যাবে ছোট খাট একটু কাজের জন্য সে কীরকম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করত। সে তখন মাদ্রাজে আটক-বন্দী। সে লিখেছিল: "প্রিয় দিলীপ, ১৫ই আগষ্ট তারিখের তোমার সস্নেহ চিঠিখানা এসে পৌঁছেছে গত মাসের ২৯শে তারিখে······তুমি যা করেছ, তা আমি কখনই ভুলবো না—প্রকৃত বন্ধুর কাজই করেছ তুমি—এত খুশী হয়েছি আমি।"

(এখানে একটু বলে নেওয়া ভাল যে আমি তাকে শুধু শ্রীঅরবিন্দের আশীর্ব্বাদী একটী ফুল পাঠিয়েছিলাম।) "আমি জানি না তোমার যোগবল গ্রহণ করার মত

সরলতা আমার আছে কিনা—হয়ত তা নেই। কিন্তু তা না থাকলেও আমার মনে হয়, যাঁরা আধ্যাত্মিক তত্ত্বে বিশ্বাসী নন, বা মনের অসীম শক্তিতে যাঁদের আস্থা নেই তাঁরাও ত 'উইলফোর্স'-এর কথা অস্বীকার করতে পারেন না। এই যে মানসিক শক্তি—তার যে নামই দেওয়া হোক্ না কেন—তারা কাজ করবেই, গ্রহীতা যদি যোগ্য পাত্র নাও হয় তবু ঐ ব্যর্থ হবে না। শ্রীঅরবিন্দের প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ—তাঁকে আমার প্রণাম জানিও।

"হ্যাঁ, মাদ্রাজ থেকে পণ্ডিচেরী বেশী দূরে নয়—কিন্তু মাঝখানে যে বাধার প্রাচীর—এইটাই ত পৃথিবীতে ভেদাভেদের সৃষ্টি করে…আমার শরীর কেমন আছে তার খুঁটি-নাটি তোমাকে জানিয়ে ব্যস্ত করে লাভ কী…শরীর আমার যেমনই হোক্—তার জন্ম মানসিক স্বাস্থ্য আমার একটুও খারাপ হয় নি—আমার মনের জোর ঠিকই আছে।

"আমি পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত আছি—তার সঙ্গে ভাবছিও অনেক কিছু; মাঝে মাঝে মনে হয় আমি যেন অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছি। কিন্তু যতক্ষণ আমার আন্তরিকতার অভাব হবে না, ততক্ষণ ত আমি অন্যায় করতে পারি না—সত্যের পথে এগিয়ে আমি যাবই, হয়ত পথটা একেবারে সোজা না হয়ে একটু ঘুরই হবে; তাছাড়া জীবন ত সরল রেখার গতিতে চলে না।

"সাধারণ ভাবে দেখলে আমাদের প্রত্যেকেরই একটা কর্ম্মক্ষেত্র আছে। আর আমাদের অতীত কর্ম্ম, বর্ত্তমান ইচ্ছা আর পরিবেশের দ্বারাই ত এই কর্ম্মক্ষেত্র নিরূপিত হয়—তাই নয় কি? কিন্তু, তা সত্ত্বেও আমাদের নিজের নিজের কর্ম্মক্ষেত্র বেছে নেওয়া কত কঠিন। এই কর্ম্মক্ষেত্রই আমাদের স্বভাব বা ধর্ম্মের বহিঃপ্রকাশ। 'স্বধর্ম্ম অনুযায়ী কাজ করে যাও'—কথাটা বলা কত সহজ—কিন্তু স্বধর্ম্মটা কী সেইটা বোঝাই ত দুষ্কর। এই জন্যই গুরুর প্রয়োজন।

"আমি জানি তুমি আমার জন্য কষ্ট পাও, আমার কথা তুমি ভাব—আর এ-ও জানি যে এই সমবেদনা বৃথা যাবে না। যেখানেই আমি বন্দী থাকি না কেন, এইটা আমার কাছে একটা বড় সান্ত্বনা। শ্রীঅরবিন্দের কর্ম্মে আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান্ (কী কথা ব্যবহার করলে ঠিক বোঝাতে পারব, বুঝতে পারছি না); বেশী কিছু বললে হয়ত সামাজিকতা হয়ে পড়বে। প্রীতি নিও—

তোমার স্নেহমুগ্ধ সুভাষ"

চিঠিটার সম্পূর্ণটাই এখানে তুলে দিলাম এই ভেবে যে যারা সুভাষ অহঙ্কারী ছিল বলে তার নিন্দা করে তাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত বুঝতে পারবে—আত্ম-গৌরব সুভাষের পক্ষে ঠিক স্বাভাবিক ছিল না। অহমিকার সম্বন্ধে অহঙ্কার থাকাটা নিশ্চয়ই চরিত্রের একটা গুণ নয়। কিন্তু আমি অনেক সময় ভেবেছি যে তার মত অবস্থায় আর কেউ কি তার চেয়ে কম 'অহঙ্কারী' হতে পারত ? আমি আগেই বলেছি যে ঠিক লাজুক না হলেও সুভাষ স্বল্পভাষীই ছিল। লাজুক বলতে আমি বুঝি পণ্ডিত নেহরুর মত ব্যক্তিকে—যদিও তাঁর কর্ম্মাবলী ও বক্তৃতার মধ্যে কেউ এই লাজুক কাশ্মীরীটির আসল পরিচয় পাবেন না। কিন্তু পণ্ডিতজী সত্যিই লাজুক, অবশ্য তাঁর লাজুক-ভাবটা রাজনীতির সংঘর্ষে এসে খানিকটা নষ্ট হয়ে এসেছে—একথা ঠিকই। বহু দিনের খ্যাতি লাজুক-ভাবটাকে নষ্ট করে দেয়—এখানে লাজুকতা বলতে আমি বুঝি আত্মপ্রকাশের অনিচ্ছাকে। পরিণত বয়সে সুভাষের পক্ষে এই লাজুকতা বাঁচিয়ে রাখা কখনই সম্ভব ছিল না। হাজারটা সাংবাদিক সম্মেলন আর বাণী দেওয়ার পর কোন অতি বড় আত্মকেন্দ্রিক শিল্পীও কি আর লাজুক থাকতে পারেন ? সুভাষের পঞ্চাশৎ জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠানে (২৩-১-৪৬) শাহ নওয়াজের একটা বড় বক্তৃতার কথা আমার মনে পড়ছে। তিনি বলেছিলেন 'সুভাষচন্দ্র গর্ব্ব করে বলেছিলেন, ইংরেজের কারখানায় এমন কোন বোমা আজ পর্য্যন্ত তৈরী হয় নাই যা সুভাষচন্দ্র বসুকে হত্যা করতে বা বিকলাঙ্গ করতে পারে।' শ্রোতারা উল্লাসে হাততালি দিয়ে উঠেছিল; কিন্তু আমি ভেবেছিলাম শাহ নওয়াজের পক্ষে একথাটা না বলাই উচিত ছিল—সুভাষ হয়ত কোন অসতর্ক মুহূর্ত্তে এই ধরণের কথা বলে ফেলে থাকবে। যে সুভাষকে আমি চিনি, সে সুভাষ সামান্য একটু প্রশংসাতেও কিশোরী মেয়ের মত লজ্জায় লাল হয়ে উঠতো। শাহ নওয়াজের এই 'নেতাজী সুভাষ'কে দত্ত কি তার প্রিয়তম বন্ধু বলে ভালবাসতে পারত ? একজন চিন্তাশীল লেখক লিখেছিলেন ! "খ্যাতি মানুষের স্বাভাবিক মানসিক অবস্থার একটা পরিবর্ত্তন আনিয়া দেয়।—একটা উপাধি, একটা উচ্চপদ, বা অন্য কোনরূপ সম্মান মানুষকে নিজের সম্বন্ধে অধিকমাত্রায় আস্থাবান করিয়া তোলে এবং তাহার ফলে তাঁহারা ভাবেন সমাজে, রাষ্ট্রে এবং যুগের কাছে তাঁহাদের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী। এবং নিজের স্বভাবেই তাঁহারা

বাহিরের সেই কৃতিত্বকে নিজের ব্যক্তিত্বে ফুটাইয়া তোলার প্রয়াস পান।" নিজের উপর বিশ্বাস থাকা আর কোন কিছু জোর করে দম্ভের সঙ্গে বলা,—এর মধ্যে পার্থক্য আছে নিশ্চয়ই। সুভাষের মত দুঃসাহসিক অনেক বীর আদর্শবাদীকেই ত সাধারণ অস্ত্রের আঘাতে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে।

সুভাষ যখন জাতীয় জীবনে বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল, তখনকার কথা আমি বলতে চাই না। যখন সে 'সাধারণ' মানুষের পর্য্যায়েই ছিল তখনকার সেই সুভাষকেই আমার বেশী ভাল লাগে। আমি মনে করি সে তখনই ছিল মহামানব, মানবতার পরিধি ছিল তার বিরাট। ভিয়েনা যাবার পথে জাহাজে বসে সে যে চিঠি লিখেছিল আমাকে—(৫—৩—৩৩) সেইটাই তার আসল পরিচয়:

"প্রিয় দিলীপ,

অনেকদিন তোমাকে চিঠি দিতে পারিনি, কিন্তু তুমি সব সময়েই আমার খবরাখবর জানতে চেয়েছ চিঠিতে। গোটা জানুয়ারী আর ফেব্রুয়ারী মাস দুটো আমার এক মানসিক অশান্তিতে কেটেছে—এর কারণ অবশ্য সরকারের অতি উৎসাহ। ঠিকই ছিল না যে শেষ পর্য্যন্ত ইউরোপ যাত্রা ঘটে উঠবে। সরকারের বদান্যতায় মা-বাবা বা বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে পাই নি। কেবল কয়েকজন অত্যন্ত নিকট আত্মীয়কে জব্বলপুর জেলে আমার সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয়েছিল। অনেক দূর দূর থেকে বন্ধুরা বোম্বাইয়ে এসেছিলেন আমার সঙ্গে দেখা করবেন বলে, কিন্তু ব্যর্থ হয়েই তাঁদের ফিরতে হয়েছে। পুলিশ অফিসার যাঁরা আমাকে তুলে দিতে এসেছিলেন তাঁরা শিকারী কুকুরের মত আমাকে ঘিরে রেখেছিলেন, জাহাজ না ছাড়া পর্য্যন্ত। এই ধরণের যন্ত্রণা আমাকে সহ্য করতে হয়েছিল বোম্বাই ছাড়ার আগে পর্য্যন্ত।

"যাই হোক্, এই সব খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়ে তোমাকে আর বিব্রত করতে চাই না। আমি জেলে ছিলাম বলে তুমি খুব কষ্ট পেয়েছ আমি জানি। আমি ঠিক এতটা আশা করিনি। আমি ভেবেছিলাম—পৃথিবীর মায়া ত্যাগ ক'রে তুমি সব কিছু ভুলে 'যোগে' মগ্ন হয়ে পড়েছ! সত্যি কথা বলব দিলীপ, যোগ আর অধ্যাত্মবাদ আমি বিশেষ বুঝি না; কিন্তু তোমার অসাধারণ মানবতা, মানুষের প্রতি তোমার ভালবাসা দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে যাই। পার্থিব সব কিছুর মায়া কাটিয়েছ, বন্ধু-

বান্ধবদের সঙ্গ ছেড়ে দিয়েছ তুমি। অথচ সেই তুমি-ই যে আমার বন্দীদশার জন্য মানসিক কষ্ট পাবে—এ আমি ভাবতে পারিনি। একটা চিঠিতে তুমি জানতে চেয়েছিলে 'শিব' সম্বন্ধে আমার ধারণা কি। সত্যি কথা বলতে 'শিব' 'কালী' আর 'কৃষ্ণ' সবাইকে আমি সমান চোখে দেখি, সবাইকে আমি শ্রদ্ধা করি সমানভাবে। যদিও তাঁরা মূলতঃ একই, কেউ একটা রূপে তাঁদের আরাধনা করে, কেউ করে অন্য রূপে। আমি দেখেছি আমার মনের ভাব সব সময় একই রকম থাকে না—মনের ভাব পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমার দেবতার রূপ বদলায়। এই তিনটি রূপের মধ্যে আবার দ্বন্দ্ব লাগে 'শিব' আর 'শক্তির' মধ্যে। পরমযোগী 'শিবের' রূপ আমাকে মুগ্ধ করে, আবার কালীর মাতৃমূর্ত্তিও আমার ভাল লাগে। তুমি জান সম্প্রতি (প্রায় ৪।৫ বছর যাবৎ) আমি মন্ত্র-শক্তিতে বিশ্বাস করি। এর আগে সাধারণ বিচারবাদী যুক্তিতে আমি মনে করতাম মন্ত্র এক একটা প্রতীক মাত্র, শুধু মনঃসংযোগের সহায়তা করে। কিন্তু, তান্ত্রিক দর্শন পড়ে আমার বিশ্বাস হয়েছে যে কতক গুলি মন্ত্রের সত্যই শক্তি আছে—এক এক মানসিক অবস্থার পক্ষে এক একটা বিশেষ মন্ত্রের প্রয়োজন। তার পর থেকে আমি বুঝতে চেষ্টা করেছি আমার মানসিক অবস্থাটা ঠিক কি রকম, কোন্ ধরণের মন্ত্র আমার পক্ষে কার্য্যকরী হবে।' কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তা পেরে উঠিনি, কারণ আমার মানসিক অবস্থা অনবরতই পাল্টায়—কখনও আমি শৈব, কখনও শাক্ত আবার কখনও বা বৈষ্ণব। আমার মনে হয় এই কারণেই গুরুর প্রয়োজন—কারণ যিনি যোগ্য গুরু তিনি আমাদের সম্বন্ধে, আমাদের নিজেদের চেয়েও বেশী বুঝতে পারেন। তিনি হয়ত তৎক্ষণাৎ বলে দিতে পারেন কার পক্ষে কোন্ মন্ত্র উপযোগী, কার পক্ষে কোন্ পন্থা শ্রেষ্ঠ।

"এবার বৈষয়িক ব্যাপারে ফিরে আসা যাক্। কালই আমি ভেনিসে পৌঁছাচ্ছি, সেখান থেকে যাব ভিয়েনায়, ডাক্তারদের সঙ্গে পরামর্শ করবো। সেখান থেকে খুব সম্ভব চলে যাব সুইজারলণ্ডের কোন স্বাস্থ্যনিবাসে। পোর্ট সৈয়দ পর্য্যন্ত ভালই লেগেছিল···সমুদ্রটা তখন ছিল শান্ত। পোর্ট সৈয়দ ছাড়বার পর থেকেই আবহাওয়াটা খুব খারাপ হয়ে উঠেছে। তলপেটের ব্যথাটা—সঙ্গে সঙ্গে অন্য উপসর্গগুলোও আছে যদিও, তবু খানিকটা যেন স্বস্তি অনুভব করছি। পোর্ট

সৈয়দে পৌঁছাবার আগে পর্য্যন্ত খুব ভালই ছিলাম—ভূমধ্যসাগরে পড়বার পর থেকে আবার খারাপ লাগছে।

"এখন লেখা থামাতে হবে—দোলানির জন্যে লিখতে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে। অশেষ প্রীতি নিও—

তোমার সুভাষ"

শ্রীঅরবিন্দ এই চিঠিটা শুনে বলেছিলেন:

(১৭—৩৩ – ৩)

"দিলীপ,

কৃষ্ণ, শিব আর শক্তি নিয়ে সুভাষের অন্তর্দ্বন্দ্বের কথা শুনে আমি না হেসে থাকতে পারি নি। যদি কেউ ঈশ্বরের একটা বা দুটো রূপের প্রতিই অনুরক্ত হয়, তা হলে ঠিকই আছে। কিন্তু যদি কেউ একই সময়ে অনেকগুলো রূপের দিকে আকৃষ্ট হয় তা হলেও উদ্বিগ্ন হবার কিছু নেই। খানিকটা উন্নতস্তরের সংস্কৃতি-সম্পন্ন মানুষ হলে, তার চরিত্রে অনেকগুলো দিক থাকাই স্বাভাবিক। আর তা হলে বিভিন্ন প্রকাশ তার বিবিধ ব্যক্তিত্বকে প্রভাবিত করবে এ আর আশ্চর্য্য কি? সে সবগুলিকেই গ্রহণ করে এক ঈশ্বর আর এক আত্মাশক্তির মধ্যে তাদের সমন্বয় সাধন করতে পারে।"

১৬

সুভাষের মধ্যে যে একটি চিন্তাশীল অধ্যাত্মবাদী মানুষ লুকিয়ে ছিল সেইটা বোঝাবার জন্যই আমি এই চিঠিগুলি প্রকাশ করছি। এ চিঠিগুলি যে একান্ত আন্তরিক ভাবে লেখা, তা চিঠিগুলি পড়লেই বোঝা যায়। আর তা ছাড়া, পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদের যাঁরা প্রশংসা করেন তাঁদের আমি বলব তার চিঠির এই একটা কথা মনোযোগ দিয়ে পড়তে: "যিনি যোগ্য গুরু তিনি আমাদের সম্বন্ধে আমাদের নিজেদের চেয়েও বেশী বুঝতে পারেন।" আমি তার সম্বন্ধে এই কথাটাই জোর দিয়ে বলতে চাই যে,—সুভাষ আসলে ছিল 'যোগী'—মনস্বী—কর্ম্মজীবনের প্রচণ্ড সংঘাতে তার এই আধ্যাত্মিক দিকটা চাপা পড়ে গিয়েছিল। যিনি দেশসেবায় আত্মোৎসর্গ করেছেন তাকে আমি যা বিশ্বাস করি সেই অধ্যাত্ম তত্ত্বে অর্থাৎ আত্মানুসন্ধান ও যোগবাদে বিশ্বাসী করে তুলব এ আশা আমার নেই—।

আমি জানি যে যোগবাদ দেশপ্রেমের চেয়ে অনেক বেশী সৃষ্টিমূলক একথা তাঁরা বিশ্বাস করবেন না। তবু আমি বলব সুভাষের মধ্যে ছিল একটি যোগীর মন,—পরমেশ্বরের সৃষ্ট এই জাগতিক ব্যাপারে মনোনিবেশ না করে সে যদি পরমাত্মার সাধনায় মগ্ন হয়ে যেত তবে সে একজন শ্রেষ্ঠ সাধক হতে পারত। পার্থিব বিবেকে সে যদি জড়িয়ে না পড়ত, তবে সে এই জীবনেই মানুষের পরমকাম্য চরমলক্ষ্যে পৌঁছাতে পারত। হয়ত আমারই ভুল, কে জানে?—

"নেহাভিক্রমণশোস্তি"—মহৎ আদর্শের ক্ষুদ্রতম প্রয়াসও বৃথা যায় না। পরমজ্ঞানী ঈশ্বরের লীলা কে বিচার করবে? তাঁর প্রিয়তম ভক্তদের জন্তই মায়াজাল বেশী করে বিস্তৃত হয়! তাদেরই ত আত্মপ্রেম বড় হয়ে ওঠে যার ফলে শেষ পর্য্যন্ত আত্মা আবিষ্কারটা চরম জ্ঞানে পরিণত হয়। মরমী সুফী কবি বলেছিলেন:

এতদিন ভেবেছিনু।—
তোমার প্রেমে মাতোয়ারা
ভালোবেসেই দিশেহারা,
তোমায় চেয়ে, তোমায় পেয়ে.
তোমায় নিয়ে, তোমায় দিয়ে
তোমার মাঝে হারিয়ে গিয়ে,
মোর এ জীবন পাগল পারা।—
অবশেষে নিরখিনু।—
সকল ভালোবাসা আমার
ঢেলেছি যে চরণমূলে,
যারে চেয়ে নিঃস্ব হ'লেম,
যার উদ্দেশে ব্যাকুল হলেম বিশ্বভুলে,
ভিড়ল তরী যাহার কূলে,—
সে কান্ত মোর আর কেহ নয়—স্বয়ং আমি।
একান্ত মোর আপন তরেই
রইনু বাঁধা নিজের ঘরে
সুদীর্ঘ এই জীবন ধ'রে।

জ্ঞানের অহঙ্কারে অজ্ঞেয় অজানা কিছু নেই বলে আমরা উড়িয়ে দিতে পারি—কিন্তু এই 'অজ্ঞেয়'র ডাক আমাদের মাঝে মাঝে হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে উদভ্রান্ত করে তোলে—একথা ত মিথ্যা নয়। যখন সহস্র কাজের মধ্যে ব্যস্ত হয়ে আছি তখনই হয়ত শোনা যায় রহস্যময় অজানার পদধ্বনি, সমগ্র সত্তাকে তোলপাড় করে বুনে দিয়ে গেল প্রেমের বীজ, হয়ত এক টুক্‌রো সৌন্দর্য্যের হাল্‌কা স্পর্শে উতলা হয়ে উঠলো মন পরম প্রিয়তমের প্রতি নিবিড় অনুরাগে। এই রকম অজানার ডাকেই সুভাষ ষোল বছর বয়সে গুরুর সন্ধানে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিল। তার যদি তখন গুরুলাভ ঘটতো, তাহলে জীবনের গতি যেত সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে। গুরুলাভ তার হয়নি বটে, কিন্তু কৈশোরে যে অমর বীজ তার মধ্যে উপ্ত হয়ে গিয়েছিল সেগুলি স্বপ্নবৃক্ষে পরিণত হয়ে উঠেছিল – তাই শত কর্ম্মের ঝঙ্কনার মধ্যেও হঠাৎ দেখি তার উদাস করুণ আত্মবিস্মৃতি আর অদ্ভুত বিষণ্ন স্থৈর্য্য। ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য এই স্বপ্নাশ্রয়ী সুদূরপ্রসারী অধ্যাত্মবাদ, তার প্রাত্যহিক জীবনের কর্ম্ম কোলাহলে একেবারে নষ্ট হয়ে যায় নি।

মান্দালয়ের জেল থেকে সে একখানা চিঠিতে লিখছিল (২—৫—১৫):
আমার মনে হচ্ছে জেলে এসে শারীরিক কষ্টের চেয়ে মানসিক যন্ত্রণাই হয় বেশী অপমান আর মাথা নীচু করার বিড়ম্বনা যখন থাকে না, তখন বন্দীজীবনের শত অসুবিধা আর নির্য্যাতনও অসহ্য বলে মনে হয় না।…কিন্তু পাছে আমরা বাইরের এই কুৎসিৎ সত্তাকে ভুলে গিয়ে অন্তরের আনন্দজগতে মগ্ন হয়ে পড়ি, সেই ভয়ে ওরা বার বার সেই অপমান আর আত্মগ্লানির আঘাত দিয়ে দিয়ে আমাদের দুঃসহ এই নিরানন্দ জীবনযাত্রার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।"

দৈনন্দিন জীবনের কর্ম্ম-কোলাহলে যে ভাববাদী অন্তর্মুখী মনটি নিস্তব্ধ হয়ে থাকত, বন্দীজীবনের নিঃসঙ্গতায় সে-ই গুঞ্জন করে উঠত অন্তর্লোকের মর্ম্মে মর্ম্মে। বন্দীজীবনের মধ্যে সে প্রায়ই বলত; "মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, আমি যেন অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছি।" কিন্তু বাইরে এলেই তার এই আত্মানুসন্ধান স্তব্ধ হয়ে গিয়ে আত্মবিশ্বাস আর কর্ম্মব্যস্ততা ফুটে উঠত। সেই চিঠিতেই সে লিখেছিল: "আমি যখন স্থিরভাবে চিন্তা করি তখন একটা দৃঢ় বিশ্বাস আমার জেগে ওঠে যে আমাদের হাজার রকমের ব্যর্থতা বিফলতার পিছনে কোন একটা

গূঢ় মহান্ উদ্দেশ্য যেন কাজ করছে। আমাদের সচেতন জীবনে যদি এই আস্থাটা সব সময় জাগিয়ে রাখতে পারতাম তাহলে দুঃখ-কষ্ট আর ব্যর্থতার বেদনার তীব্রতা কত কমে যেত! দুঃখের অতল গহ্বরে বসেও আমরা ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদকে অনুভব করতে পারতাম।"

বাইরের প্রকাশটাকে ভেদ করে অভ্যন্তরে পৌঁছবার তার এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই ছোটবেলা থেকে আমাকে তার প্রতি আকর্ষণ করেছে। কারণ আমি তখনো হঠাৎ বাইরেটা দেখে নেচে উঠতে পারতাম না—এবং কতকটা নিরাশাবাদীই ছিলাম। সুভাষ মোটামুটি আমার চেয়ে আশাবাদী হলেও আমার মতকে সমর্থন করত। কিন্তু কালক্রমে আমাদের এই মতবাদের মধ্যে পার্থক্যটা তীব্রতর হয়ে উঠেছিল। বাবুট্রাণ্ড রাসেল একবার আমাকে বলে ছিলেন, "দেশপ্রেম শেখাতে যাওয়ার চেয়ে আমি মৃত্যুকেই শ্রেয় মনে করি।" আনন্দের আবেগে আমি নেচে উঠেছিলাম তাঁর এই কথাটিতে। আমার পক্ষে তখন এই রকম একটা জোর আঘাতই দরকার ছিল সুভাষের দেশপ্রেমের বন্ধন থেকে আমাকে মুক্ত করার জন্য : সুভাষের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে আমি তার দেশপ্রেমের সংস্পর্শে না এসে পারতাম না, অথচ আদর্শগত-ভাবে এ ছিল আমার চরিত্র-বিরোধী। সুভাষের মধ্যে তার সেই স্বপ্নাশ্রয়ী আর অন্তর্মুখী মনটি ছিল বলেই শেষ পর্য্যন্ত আমাদের বিচ্ছেদ হয় নি কোনদিন।

১৮

যে চিঠিগুলি উপরে উদ্ধৃত করলাম তা থেকেই বোঝা যায় সুভাষের মন ছিল কত কোমল। অনেক ছোটখাট ব্যাপার আমরা মনেই রাখিনা ; কিন্তু সুভাষ সেগুলি মনে ত রাখতই—উপরন্তু তার প্রতিদান দেবারও চেষ্টা করত। কারো কাছে কিছু পেয়েছি এইটা মনে হলেই, সে কৃতজ্ঞ বোধ করত, আর তার প্রতিদানের জন্য উৎসুক হয়ে উঠত। শিল্পকলা ও শিল্পীর প্রতি তার মনোভাব থেকেই তার এই দিকটা আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সাধারণভাবে শিল্পের প্রতি সে বিশেষ মনোযোগ দিত না ; কিন্তু যখনই কোন শিল্পীর সৃষ্টি তাকে মুগ্ধ করত, তখনই সে সেই শিল্পীর কোন না কোন কাজ করে দেওয়ার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠত। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কথা ইতিপূর্ব্বেই বলেছি। কিন্তু কাজী নজরুল ইসলামের প্রতি

তার দরদ আর কৃতজ্ঞতা ছিল অতুলনীয়। যারা সর্ব্বহারার মত জীবনযাপনের জন্য ইচ্ছা করে ভবঘুরে ছন্নছাড়া জীবন বেছে নেয়, তাদের সুভাষ পছন্দ করত না—নজরুল সম্বন্ধেও তার অমনিই একটা ঔদাসীন্য ছিল। আমার কাছে যখন নজরুলের কথা শুনত তখন সে চুপ করে থাকত পাছে আমি মনে কষ্ট পাই। হঠাৎ আমার আয়োজিত এক সাহায্যানুষ্ঠানে ওদের দুজনের দেখা হয়ে গেল। নজরুল তাঁর বিখ্যাত গানটি গাইলেন :

"দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার হে,
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুঁশিয়ার।"

কয়েকদিন পরে সুভাষ এলো আমার কাছে। কোন ভূমিকা না করে সোজাসুজি সে বলল—"দেখো দিলীপ, আমি এসেছি কাজী নজরুলের জন্য। ওঁর সম্বন্ধে কী করছ তুমি?"

সুভাষ ছাড়া অন্য কেউ যদি হত আমি সত্যই আশ্চর্য্য হতাম।—কিন্তু আমি জানতাম সুভাষকে—এ হবেই।

আমি বল্লাম—"সুভাষ একটা গল্প বলি শোনো। হাইকোর্টের এক জজসাহেব ছিলেন—জুরীদের সবার অমতে তিনি এক অদ্ভুত রায় দেন—সবাই বুঝতে পারছে আসামী নির্দ্দোষ, তবু তিনি তাকে শাস্তি দেন। আসামীপক্ষের প্রধান উকীল চুপ করে রইলেন কিন্তু তাঁর সহকারী সহ্য করতে না পেরে প্রতিবাদ জানিয়ে উঠল এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে। ধর্ম্মাবতার গর্জ্জন করে উঠলেন—'কোর্টের অবমাননা।' প্রধান উকীলটি তখন বললেন—'ধর্ম্মাবতার, আমার তরুণ বন্ধুটিকে ক্ষমা করুন। ওর যদি আমার মত বয়স হত, ও কখনই আপনার প্রদত্ত কোন রায়েতেই আশ্চর্য্য হত না।"

হাসি একটু কমলে সুভাষ বলল। "তাহলে আশ্চর্য্য হয়ে নাও, পাজী কোথাকার। কিন্তু সে যাই হোক্ এ সম্বন্ধে আমাদের কিছু করতেই হবে। নজরুলকে ওঁর ওই সাঙ্গপাঙ্গদের হাত থেকে উদ্ধার করতেই হবে।"

"হ্যাঁ ছোক্‌রার বুদ্ধি আছে স্বীকার করতে হবে। কিন্তু স্যার, ঘোড়াটাকে জোর করে না হয় জলের ধারে নিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু তারপর জল সে কিছুতেই খাবে না যে।"

সুভাষের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল : "তোমার ঠাট্টাটা কিন্তু এক্ষেত্রে খাটে না। মানুষ ত ঘোড়া নয়, দিলীপ।"

"কুকুরও ত নয়", আমি জোর করে বল্লাম ঠাট্টার রেশ টেনেই। জানো ত একজন ফরাসী ভদ্রলোক বলেছিলেন, 'যতই তুমি কুকুরের সঙ্গে মিশবে, মানুষকে আর তোমার ভাল লাগবে না।' দত্ত বলত এই ভদ্রলোকটি হচ্ছেন ভলটেয়ার, মনে আছে? না সুভাষ, আমি ঠাট্টা করছি না। তুমি কাজীকে "জানো না, আমি জানি বলেই বলছি—উনি যেমন আছেন তেমনই থাকুন।"

"তার মানে? কী বলতে চাও তুমি?"

"শত্রুর হাত থেকে মানুষকে উদ্ধার করা যায়, কিন্তু সে শত্রু যদি তার নিজের মধ্যেই থাকে তাহলে কি পারা যায়?"

"তাহলে তুমি কি বলতে চাও, ওঁকে এইভাবে বিসর্জ্জন দেব?"

"ঠিক ধরেছ ত, সুভাষ, তোমার কী বুদ্ধি—"

"না, না, ঠাট্টা রাখ—আমি মোটেই ঠাট্টা করছি না। তোমার একজন প্রিয় বন্ধু নষ্ট হয়ে যাচ্ছে জেনে-শুনে তুমি চুপ করে বসে থাকবে?"

"আগে হয়ত পারতাম না; কিন্তু এখন পারি। শোনো সুভাষ, জীবনের অনেক অভিজ্ঞতাই আমাদের বাকী আছে। কিন্তু একটা অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে—কাউকে শোধরাতে যাওয়ার চেষ্টা করার মত বোকামি আর কিছু নেই। কাজী খুব চমৎকার লোক, কিন্তু তার কতকগুলো খেয়াল আছে—সে খেয়াল সে ছাড়তে পারবে না।"

"তার মানে, তুমি বলছ—"

"হ্যাঁ, ও যেমন আছে তেমনি থাক।"

কিন্তু সুভাষের পক্ষে তা সম্ভব ছিল না। কেউ যদি স্বেচ্ছায় মরতেও চায় তাহলেও সুভাষ তাকে বাঁচাবার জন্য শেষ পর্য্যন্ত চেষ্টা করবে, তাতে যত বিপত্তিই আসুক না কেন। এর জন্য অনেকবার তাকে বেশ বিপদে পড়তে হয়েছিল, কিন্তু নিজের গা বাঁচিয়ে চলার মত ছেলে সুভাষ ছিল না। সচরাচর উগ্র সাম্যবাদীদের সঙ্গে সে মোটেই মিশত না বটে কিন্তু তার কাছে কেউ সাহায্যের জন্য এলে সে আপ্রাণ চেষ্টা করত তাদের সাহায্য করবার জন্য।

আমার কাছে এইরকম একজন এসেছিলেন রাশিয়া থেকে—আমি তাঁকে আশ্রয় দিই নি। কিন্তু সুভাষ দিয়েছিল। ব্যাপারটা বাইরে জানাজানি হয়ে যাওয়ার ফলে সুভাষকে রীতিমতই বিপদে পড়তে হয়েছিল। সুভাষ অনেকেরই এভাবে উপকার করেছে নিজে বিপদ ঘাড়ে নিয়েই—কিন্তু তার পর অনেকেই তারা তার বিরুদ্ধে নিন্দা করতে কসুর করেন নি।

এইভাবে উপকারের বদলে কৃতঘ্নতা পেলে আদর্শবাদী কর্ম্মীর মনে অশ্ববিাস আসা অস্বাভাবিক নয়। এইসব অভিজ্ঞতার ফলে শেষ পর্য্যন্ত সুভাষের মানসিক অনেক পরিবর্ত্তন ঘটেছিল। ত্রিশ বছর বয়সেই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের একটা কথা তাকে প্রায়ই বলতে শোনা যেত।—"মাত্র একবছর অসহযোগ আন্দোলনে নেমে আমাকে যত ভণ্ডদের সঙ্গে মিশতে হয়েছে, পঁচিশ বছর আদালতে ঘুরেও তা হয়নি।"

পরবর্ত্তী জীবনে সুভাষ অত্যন্ত নিঃসঙ্গ বোধ করত, তার সহকর্ম্মী দেশপ্রেমিক বলে অল্প কয়েকজনকেই সে বিশ্বাস করতে পারত। ওপরেরঘ টনাগুলোর উল্লেখ করলাম শুধু এই জন্যই। শরৎচন্দ্র বলতেন—"অকৃতজ্ঞতা শুধু উপকৃতের অপকারই করে না, উপকার যে করে তার মানবপ্রীতিকেও আঘাত করে।" এই জন্য সুভাষকে তিনি প্রায়ই সাবধান করে দিতেন।

পরবর্ত্তী জীবনে যখন রাজনীতিক্ষেত্রে ব্যর্থতার আঘাত আসছিল একের পর একটা, সুভাষ তখন সহকর্ম্মীদের ওপর কখনো কখনো অত্যন্ত কঠোর হয়ে উঠত—এর কারণ তার প্রথম জীবনের এই অভিজ্ঞতাগুলি। এই তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলেই জওহরলালের মত উদার ব্যক্তিত্বের প্রতিও সে ঠিক সুবিচার করে উঠতে পারে নি। তার কোন কোন সহকর্ম্মী যখন জওহরলালের বাঙ্গালী-বিদ্বেষের কথা বলে তাকে সাবধান করে দিতেন, তখন যে আগের সেই তরুণ সুভাষ থাকলে, নিশ্চয়ই সাবধান বাণীগুলি হেসেই উড়িয়ে দিত,—এ আমি নিশ্চয়ই জানি। আমার মনে হয়—এ ব্যাপারটা একটা অত্যন্ত দুঃখ ও লজ্জার কথা। জওহরলালকে সংকীর্ণ প্রাদেশিকতাবাদী আখ্যা দেওয়া নির্ব্বোধের পক্ষেই সম্ভব। সবচেয়ে সংকটের সময় রাজনীতির আবর্ত্তে যখন ভারতবর্ষের দিশাহারা হয়ে পড়ার সম্ভবনা দেখা গিয়েছে তখন এই ব্যক্তিত্বটিই ত উগ্র জাতীয়তাবাদ আর

সাম্প্রদায়িকতার বেড়া ডিঙিয়ে আমাদের এনে দিয়েছে নির্মল দেশপ্রেমের আলোকবর্ত্মে।

যখন সুভাষ ১৯৩৯ সালে জওহরলালের পরামর্শ অগ্রাহ্য করে দ্বিতীয়বার কংগ্রেস সভাপতির পদপ্রার্থী হয়েছিল তখন একটা চিঠিতে আমি একথা খুলেই বলেছিলাম। নানা 'বন্ধুর' উপদেশে সে আমার কথা রাখবে না, একথা ভেবে আমি দেখেছিলাম। তবু সে চিঠি আমি না লিখে পারিনি—শেষ পর্য্যন্ত সে আমার কথা বা জওহরলালের পরামর্শ সত্যিই রাখেনি। তার 'বন্ধুরা' তার মনে এই ধারণা জাগিয়ে তুলেছিল যে, ভারতবর্ষের সংকটমুহূর্ত্তে সে-ই ভাগ্যনির্দ্ধারিত পুরুষ—তাকে ছাড়া দেশচালনা সম্ভব নয়। আমার চিঠিতে আমি তাকে এই কথাটা বোঝাতে চেয়েছিলাম যে—"আমাদের সবারই প্রয়োজন আছে—কংগ্রেসের ঊর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে বিরোধের ফলে তার মনে তখন জ্বালা ধরে গিয়েছে, তার পক্ষে তখন পদত্যাগ করা সম্ভব নয়, তবু আমি তাকে বলতে চেয়েছিলাম যে এ পদত্যাগের পরিণাম তার পক্ষে ভালই হবে। কিন্তু মানুষ ত মানুষই, আবেগের বশে ভুল করা স্বাভাবিক। জীবন সমুদ্রে যখন আমরা পাড়ি দিই, তখন বুদ্ধিটা হয় আমাদের দাঁড়, কিন্তু ঝড় যখন আসে, ঝড়ের সংঘাতে সৃষ্টি হয় ঘূর্ণীবাত্যার; সে বাত্যায় আমরা যাত্রাপথ ঠিক রাখতে পারি না। সুভাষের পক্ষেও এই অসাধারণ অবস্থার মধ্যে যাত্রাপথ ঠিক রাখা সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

কিন্তু জওহরলাল ত কখনো এই ধূলিবাত্যার মধ্যে দিশাহারা হয়ে পড়েন নি! আমি কতবার ভেবেছি সত্যই যদি জওহরলাল আর সুভাষ আন্তারিকভাবে বন্ধু হতে পারিতেন। কিন্তু কেন তা হয়নি?

ভারতবর্ষের এই দুটি বিরাট ব্যক্তিত্বের মধ্যে অনেক কিছু সামঞ্জস্য ছিল, বাহ্যিক ও চারিত্রিক। দুজনেই ওঁরা ছিলেন অভিজাতবংশীয়, সুশ্রী ও স্বাস্থ্যবান্; দুজনের চরিত্রেই ছিল আকর্ষণ করার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা, উদারতা, আন্তরিকতা, স্নেহশীলতা, অপরিসীম উদ্যম। তবু তাঁদের মধ্যে এই বিরোধের প্রাচীর কী করে গড়ে উঠল?

আমার মনে হয় এর পিছনে আছে তাঁদের পরস্পরবিরোধী কোন সংস্কার।

এটা যে ঠিক কী তা অবশ্য আমি বোঝাতে পারব না। কেন একজন মানুষ অপর একজনের প্রতি আকৃষ্ট হয় তা আজ পর্য্যন্ত একটা রহস্যই রয়ে গিয়েছে। নীতিবিদেরা ও মনস্তত্ত্ববিদেরা বলেন; এর কারণ চারিত্রিক সামঞ্জস্য,—আমি আমি একথা মানতে রাজী নই। জওহরলাল আর গান্ধীজীর মধ্যে চারিত্রিক কোন সামঞ্জস্য আছে কি? সুভাষ আর তার রাজনৈতিক জীবনের গুরু দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মধ্যেই বা কী সামঞ্জস্য ছিল? চরিত্র একটা কারণ হতে পারে, কিন্তু সম-আদর্শ, সমস্বার্থ, অথবা কোন নেতার প্রতি আনুগত্য; এগুলিও নিশ্চয়ই তার অপর কারণ হতে পারে। জওহরলাল আর সুভাষের মত এই দুই ব্যক্তিত্বের মধ্যে কী করে বিরোধ সম্ভবপর হয়, তার কারণ সত্যই রহস্যময়। যোগ অভ্যাস করার আগে পর্য্যন্ত আমি চারিত্রিক সামঞ্জস্যের নীতিতে বিশ্বাস করতাম। আমার মনে হয়, জওহরলালের চরিত্রে বুদ্ধিবাদটাই প্রধান, আর সুভাষ মূলতঃ ধর্ম্মবাদী তাই হয়ত এঁরা মিলতে পারেননি। তখনো সংস্কারের জটিল গ্রন্থিগুলি সম্বন্ধে বোঝার ক্ষমতা আমার ছিল না। সংস্কারের এই জটিল গ্রন্থির অন্ততঃ কতকগুলি খুলে ফেলতে না পারলে মানুষকে বিচারবুদ্ধিশীল বলা যায় না। আমি একটা কথা এখানে সাহস করে বলতে চাই। জওহরলাল সম্বন্ধে সুভাষের একটা আশঙ্কা ছিল—মস্কোর প্রতি তাঁর সাদর অভিনন্দন ও সোভিয়েট সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ সুভাষের এই আশংকাকে দৃঢ়তর করেছিল: ধর্ম্ম আত্মাকে আফিমের ঘুমে আচ্ছন্ন করে রাখে—এই সাম্যবাদী মন্ত্র জওহরলাল সমর্থন করতেন। এইখানেই সুভাষের ছিল ভয়। জওহরলালের বিচারবুদ্ধির প্রতি আমার প্রখর শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও আমি একথা স্বীকার না করে পারছি না যে, এ ক্ষেত্রে সুভাষের মতই অভ্রান্ত বলে আমি মনে করি। আরো একটা বিষয়ে তাঁদের মিল ছিল না: জওহরলাল তাঁর আত্মচরিতে বলেছিলেন কোন এক অজ্ঞাত কারণে ভারতবর্ষের চেয়ে তাঁর কাছে বাইরের টান বেশী, অথচ সুভাষ বাইরে গেলেই আকুল হয়ে উঠত ভারতবর্ষের মাটিতে ফিরে আসার জন্য। তাই জওহরলালের পক্ষে মস্কোর নির্দ্দেশ নেওয়া সম্ভব হলেও (সম্প্রতি অবশ্য তাঁর মত পরিবর্ত্তন হয়েছে) সুভাষের পক্ষে ভারতবর্ষের বাইরের আমদানী করা কোন মতবাদ গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না, বিধ্বস্ত ভারতের পুনর্গঠনের জন্যও যদি তা প্রয়োজন হয়, তবুও নয়।

সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী ও ধারণার এই যে মূলগত পার্থক্য এর কারণ শুধু বাহ্যিক চরিত্রের মধ্যে খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। সেই জন্যই আমি এটাকে বলেছি সংস্কারগত বিরোধ, সুভাষের সঙ্গে ১৯৩৯ সালে আমার যে আলোচনা হয়েছিল তা থেকে হয়ত এই দুর্জ্ঞেয় রহস্যটির খানিকটা ধারণা পাওয়া যাবে। আমাদের কী কথাবার্ত্তা হয়েছিল পরের পরিচ্ছেদে তা তুলে দিলাম।

উনিশ

তখন আমরা কলকাতায়। সেদিন মধ্যাহ্নভোজনের পর তাকিয়া আর পাশবালিশ নিয়ে বেশ আরাম করে গড়াগড়ি দিচ্ছি। এটা সেটা গল্প করতে করতে এক সময় আমি বলে ফেললাম, "জওহরলালকে আমার খুব ভাল লাগে, ওঁকে কারো ভাল না লেগে পারে না।"

সুভাষ আমাকে একবার নিরীক্ষণ করে নিল। তারপর বলল—"মনে আছে তোমার, শরৎবাবু বলতেন—আমাকে দেখে যতটা বোকা ভাবো তোমরা তা আমি নই ?"

আমি একবারে নিরীহ ভালমানুষের মত বললাম—'তার মানে, তোমার একথা বলার অর্থ ?'

সে হো-হো করে হেসে উঠে বলল—'যে কথার মানে আমরা জানি, তার জন্য কি আর ডিক্‌সনারী দেখতে যাই কেউ ?'

'কিন্তু আমি জহরলাল সম্বন্ধে যা বলতে চাইছিলাম, তুমি তা বলতেই দিলে না। আর এতে ডিক্‌সনারীর কথাই বা ওঠে কোথা থেকে ? তোমার সঙ্গে পেরে ওঠা মুস্কিল—'

সুভাষ আমাকে একটা ধাক্কা দিয়ে বলে উঠল : 'অঃ, তার মানে আমি কথা ঘুরিয়ে নিচ্ছি ধরা পড়ে গিয়ে, আর তুমি একেবারে কিছুই বোঝনা, না ? রাখো, তোমার ও সব চালাকি আমি বুঝি।' তারপর হঠাৎ অন্যস্বরে বলল—'ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আমাকে দিয়ে বলিয়ে নেবার দরকার নেই, নিজে থেকেই আমি বলছি।'

'কী বলবে তুমি ?'

'জহরলাল সম্বন্ধে আমার মতামত কী খোলাখুলি বলছি।'

'সত্যি, আচ্ছা বলোত ?'

কিন্তু সে হঠাৎ যেন ধ্যানমগ্ন হয়ে গেল। কোন কিছু গভীরভাবে আলোচনা করতে গেলেই, সে এইরকম ধ্যানমগ্নের মত হয়ে যেত—তার চোখে, যেন সেই সুদূর-প্রসারী দৃষ্টি। আমার কেমন যেন ভয় করতে লাগল। সে কী এমন কিছু বলে ফেলবে, যা আমার কাছে প্রীতিকর নয় ? সেটা কি ঠিক বাঞ্ছনীয় হবে ? জওহরলালকে আমার ভাল লাগে, একথা ত আমি অস্বীকার করতে পারি না। তা ছাড়া তিনি একবার আমাকে যে একটা বিশ্রী ব্যাপার থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন, সে কি আমি ভুলতে পারি ? ঘটনাটা এখনো আমার স্পষ্ট মনে পড়ছে।

কুড়ি

উনিশশো বাইশ কি তেইশ সাল হবে। সুভাষের বাড়ীতে আমার গান গাইবার নিমন্ত্রণ—শ্রোতা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক কর্ণধারেরা। উদ্যোক্তা স্বয়ং চিত্তরঞ্জন দাস। জওহরলাল, শরৎচন্দ্র বসু, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, তুলসী গোস্বামী আরো অনেক ছোট বড় নেতারা আছেন। গান্ধীটুপি আর ফেজপরা বিভিন্ন প্রদেশের কর্ম্মীরা ভিড় করেছেন সেই আসরে। আমার মনের মধ্যে এক শিহরণ, ভারতবর্ষের এই শ্রেষ্ঠ সন্তানদের গান শোনাবো আমি !

হঠাৎ দেশবন্ধু তাঁর ভারী গলায় বলে উঠলেন—'আপনারা একটু চুপ করুন। স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের লেখা একটি বিখ্যাত যুদ্ধসঙ্গীত শোনাবে দিলীপ। দিলীপ স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলালের ছেলে।' গানখানা হলো—'ধাও ধাও সমর ক্ষেত্রে'। সুভাষ উপস্থিত থাকলে, গান গাইতে গাইতে, ওর দিকে বারবার ফিরে তাকান আমার একটা বদ অভ্যাস। আমার গান শুনে ওর ভাল লাগছে না খারাপ লাগছে, এটুকু দেখবার লোভ আমি সংবরণ করতে পারতাম না। গানশুনে সুভাষ যে সময় সময় মুগ্ধ হয়ে যেত সে কথা আগেই বলেছি, কিন্তু আমি যখন বুঝতে পারতাম ও আমার গান মুগ্ধ হয়ে শুনছে তখন আমার মনে যে কী আনন্দ কী হত তা বোঝাতে পারব না। তখন আমি যেন সঙ্গীত জগতের গভীরে চলে যেতে পারতাম সব কিছু ছেড়ে। কিন্তু এখানে আমি একটা বড় আঘাত খেলাম

—আমি যখন প্রাণ দিয়ে সেই গভীরে পৌঁছাবার চেষ্টা করছি তখন মৃদু গুঞ্জনে হঠাৎ আমার ধ্যানভঙ্গ হয়ে গেল। নেতারা তখন নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা সুরু করে দিয়েছেন। গানের শেষ কলি তখনো গাওয়া হয়নি, মাঝ পথে আমি থেমে গেলাম অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে।

সুভাষ আমার পাশেই ছিল। সে লজ্জিত হয়ে বলল 'দিলীপ, খুব অন্যায় করে ফেলেছি, এর জন্য আমিই দায়ী—আমার বোঝা উচিত ছিল।'

হঠাৎ আমরা চমকে উঠলাম: জওহরলাল অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে তীব্র কণ্ঠে বলে উঠলেন—"আপনারা যাঁরা গান শুনতে চান না, তাঁরা দয়া করে যাঁরা চান তাঁদের বাধা সৃষ্টি করবেন না।"

সকলে লজ্জিত হয়ে চুপ করে গেলেন—মুহূর্ত্তের মধ্যে সব নিস্তব্ধ হয়ে পড়ল। আবার আমি সুরু করলাম আমার গান।

সেদিন থেকে আমি জওহরলালকে ভালবেসেছি, তাঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতা কোনদিন মুছে যাবে না। আমার কতকটা প্রথম দেখাতেই ধারণা হয়েছিল যে আমার ধর্ম্মস্পৃহা আর বিজ্ঞান-বৈরাগ্যের জন্য তাঁর কাছে কোনদিনই আমার কদর হবে না, কিন্তু একথা জেনেও আমি তাকে ভালবেসেছি শ্রদ্ধা করেছি। আমি মাঝে মাঝে ভেবেছি সেদিনকার সেই ঘটনা যদি না ঘটত, অপমানের গ্লানি থেকে তিনি যদি আমাকে সেদিন বাঁচিয়ে না দিতেন তাহলে কি শুধু তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রতি আমার এই শ্রদ্ধা এত প্রগাঢ় হতে পারত। কে জানে হত কি না। কিন্তু সে যাই হোক্, দিনের পর দিন তাঁর প্রতি আমার এই শ্রদ্ধা বেড়েছে বই কমেনি। বিশেষ করে ১৯৩৬ সালে তাঁর নিঃসঙ্গতা ও কঠোর ন্যায়পরতার জন্য আমি তীব্র বেদনা অনুভব করেছি। তাঁর 'আত্মচরিত' আমাকে বিচলিত করে তুলেছিল। তবু তিনি প্রকৃত আনন্দের সন্ধান পান নাই ভেবে আমি শ্রীঅরবিন্দের কাছে জানতে চেয়েছিলাম, জওহরলালের জন্য কি আমি প্রার্থনা করব? শ্রীঅরবিন্দ মত দিয়ে বলেছিলেন, "জওহরলালের একটা দেহাতীত শক্তি আছে; এই জন্মেই হোক্ বা পরজন্মেই হোক্, সে উৎস এই মনের সীমা ছাড়িয়ে।"

একুশ

আমি জহরলালের জন্য প্রার্থনা সুরু করেছিলাম। ঠিক এই সময়েই রাজকুমারী "বি" আত্মীয় বিয়োগে শোকাচ্ছন্ন হয়ে আমার কাছে চিঠি লেখেন। গুরুদেবের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ করে দেওয়ার পর আমি তাঁর জন্যও প্রার্থনা সুরু করি, যদিও তখন পর্য্যন্ত প্রার্থনার ওপর আমার বিশেষ কোন বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু তার পর আমার মত পরিবর্ত্তন হয়: কী করে হ'লো নীচের চিঠিগুলি পড়লেই তা বোঝা যাবে।

১৯৩৬ সালের ৭ই অক্টোবর আমি শ্রীঅরবিন্দকে লিখি:

"গুরুদেব, সেদিন সন্ধ্যায় আমি যখন জওহরলাল আর রাজকুমারী 'বি'-র জন্য প্রার্থনা করি, ঠিক সেই সময়েই রাজকুমারী 'বি' এক অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতা লাভ করেন। কী করে তা সম্ভব হলো? বাঙ্গালোর থেকে তিনি লিখেছেন ধ্যানমগ্ন অবস্থায় আমাকে ও "মা"কে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন। তার পর থেকে পণ্ডিচেরী যাবার জন্য তিনি খুব আকুল হয়ে উঠেছেন। তিনি এক অপূর্ব্ব শান্তি অনুভব করেছেন, এবং তিনি বলছেন আমার প্রার্থনার জন্যই এটা সম্ভব হয়েছে। সত্যই কি তাই? অথচ আমি প্রার্থনার এই শক্তি সম্বন্ধে নিজে সন্দিহান। কিন্তু আমি ঠিক জানি জওহরলাল কখনো এরকম অনুভূতি লাভ করেন নি। আমার প্রশ্ন এই: কোন কোন প্রার্থনায় এমন চমৎকার ফল হয় আর কোনটায় মোটেই হয় না, এর কারণ কি?"

শ্রীঅরবিন্দ লিখলেন: "দিলীপ, রাজকুমারী 'বি'-র যে অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে তা ত স্বাভাবিকই। কারণ তার নিজের কথাতেই ত বুঝতে পারছ দৈহিক সীমা ছাড়িয়ে আত্মার গভীরে প্রবেশ করার তার স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। ধ্যানদৃষ্টির অর্থই ত তাই। মানুষ যখন দৈহিক মানসে বাস করে, তা থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় হলো ধ্যানদৃষ্টি বা মনশ্চিত্র (প্রসঙ্গতঃ বলা যায় কাব্য বা শিল্প এই জন্যই মনের ওপর এতটা প্রভাব বিস্তার করে); কিন্তু এই মনশ্চিত্রগুলি প্রকৃতপক্ষে দেহাতীত অভিজ্ঞতারই ছায়ামূর্ত্তি, এবং একবার এই দৈহিক মানসের বাধা উন্মুক্ত হয়ে গেলে এই অভিজ্ঞতা লাভ ঘটবেই, অবশ্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

এর উপযোগী হওয়া চাই। এর থেকেই কল্পচিত্রের সৃষ্টি হয়—যাকে ভুল করে বলা হয় দিব্য দৃষ্টি।

"প্রার্থনা সম্বন্ধে ধরাবাঁধা কোন নিয়ম নেই। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রার্থনার ফল হয়, কখনো বা হয় না। একটা প্রত্যক্ষ উদাহরণও দিতে পারি। আমার মামা কৃষ্ণকুমার মিত্রের (সঞ্জীবনী পত্রিকার সম্পাদক) বড় মেয়ের একটা অসুখের সময় ডাক্তাররা হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন, ওষুধ পত্রও শেষ পর্য্যন্ত বন্ধ করে দেওয়া হলো, কারণ সে তখন চিকিৎসার বাইরে। মেয়েটির বাবা বললেন —ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা ছাড়া আর কিছু করবার নেই। তিনি প্রার্থনা সুরু করেন এবং তারপর থেকেই মেয়েটি বেশ ভাল হয়ে উঠতে লাগলো; টাইফয়েড জ্বরও গেলো ত তার উপসর্গগুলিও দূর হলো। এরকম অনেক ঘটনাই আমি জানি। তুমি হয়ত বলবে, তাহলে সব ক্ষেত্রে হয় না কেন? আমি বলব, হবেই বা কেন? এ ত আর একটা যন্ত্র নয় যে তার মধ্যে প্রার্থনাটা প্রবেশ করিয়ে দিলে আর অমনি তার ফল বেরিয়ে আসবে সঙ্গে সঙ্গে! আর তা ছাড়া মানুষ একই সঙ্গে এত রকমের উল্টোপাল্টা পরস্পরবিরোধী জিনিষের জন্য প্রার্থনা করে যে তার সবগুলিই যদি পূর্ণ করতে হয় তবে তাঁর পক্ষে সম্ভবই বা হয় কী করে?"

অস্কার ওয়াইল্ড বলেছিলেন—লোভ সংবরণ করার শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে, তার কাছে আত্মসমর্পণ করা। কথাটা ঠিক নয়, বরং উল্টোটাই ঠিক। লোভের কাছে আত্মসমর্পণ করলে তার আগুন জ্বলতেই থাকে ইন্ধন পেয়ে। এই যে অদম্য সংস্কার আমাদের মধ্যে রয়েছে, সেটা বুঝতে হলে, আমার সঙ্গে গুরুদেবের যে পত্র বিনিময় হয়েছিল ১৯৩৬ সালের সেপ্টেম্বরে সেগুলি উদ্ধৃত করা দরকার।

বাইশ

আমি লিখেছিলাম, "গুরুদেব, সম্প্রতি আমি জওহরলালের আত্মচরিত পড়ে তন্ময় হয়ে গিয়েছি। সত্যই বইখানা আমাকে বিচলিত করে দিয়েছে। তাঁর একনিষ্ঠ বিশ্বাসের দৃঢ়তায় আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছি। তাঁকে আমি নতুন দৃষ্টিতে দেখছি এখন। আমার মনে আছে আগে সুভাষ আর আমি কত সমালোচনা করতাম তাঁর গান্ধীভক্তির ফলে তাঁর নিজের যে চারিত্রিক দোষ তা কাটিয়ে উঠেছেন

বলে। সুভাষ বলত, আর আমিও অবশ্য তাতে সায় দিতাম আধাআধি—যে, ব্যক্তিত্ব-প্রীতি কখনই ভগবৎ-প্রেমকে ছাড়িয়ে ওঠাউ চিত নয়। আমি অনেক সময় ভেবেছি ঈশ্বরের যে নৈর্ব্যক্তিকতা তার কী কোন গূঢ় মর্ম্ম আছে? ভাগবতে মানুষ পুরুষোত্তম কৃষ্ণের ক্রীড়াসঙ্গী হয়েছিল বলে দেবতারা মানুষকে ঈর্ষ্যা করতেন। বিবেকানন্দ বোধ হয় এই নিয়েই তিরস্কার করেছিলেন নিবেদিতাকে 'তুমি এখনো ভারতবর্ষকে বোঝ নি। আমরা ভারতবাসীরা মানুষের পূজা করি। আমাদের ঈশ্বর হলো মানুষ…প্রতিমূর্ত্তিটার মধ্যে ঈশ্বর আছেন একথা তুমি সব সময়েই বলতে পার, কিন্তু ঈশ্বর যে একটা প্রতিমূর্ত্তি, একথা ভাবা কখনই চলবে না—এটা ভুল।' এই তিরস্কার আমাকে যেন স্তম্ভিত করে দেয়। ………যাই হোক্ জওহরলালের আত্মচরিত পড়ে আমার মনে হয়েছে তাঁর সত্যানুসন্ধানের সঙ্গে আমাদের যেন কতকটা মিল আছে, রাজনীতিতে গুরুবাদের মত। কেনই বা হবে না? আমাদের এই কথা শুনলে তিনি নিশ্চয়ই চমকে উঠতেন।"

শ্রীঅরবিন্দ পরের দিন সকালেই উত্তর লিখলেন: "তুমি ঠিকই বলেছ। ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে কথা হচ্ছে ঈশ্বর ও সত্যের ব্যক্তিগত ও নৈর্ব্যক্তিক দুটো দিকই আছে; শুধু নৈর্ব্যক্তিক দিকটা সত্য বা প্রয়োজনীয় একথা মনে করা ঠিক নয়; কারণ এর ফলে একটা দিকে সম্পূর্ণ শূন্যতাই রয়ে যায়। নৈর্ব্যক্তিকতা হলো বুদ্ধি-প্রবণ মনের, স্থিতিমান আত্মার; আর ব্যক্তিত্ব হলো হৃদয়ের, ওটা পরিবর্ত্তনশীল। যাঁরা ব্যক্তি-ঈশ্বরকে বাদ দিতে চান তাঁরা একটা মস্ত বড় ভুল করেন,—অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটা দিকই বাদ পড়ে যায় তাতে।"

আমি আবার লিখলাম: "গুরুদেব, আমি জওহরলালের আত্মচরিত শেষ করছি। আমি এখন ধ্যান করতে পারছি না—আমার ধ্যান করার মত মন স্থির হচ্ছে না গত একসপ্তাহ ধরে। বইটা যেন আমাকে আচ্ছন্ন করে রয়েছে। কিন্তু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী যেন পাশ্চাত্যপন্থী, শুধু তাঁর জীবনযাত্রার প্রণালী নয়, তাঁর সত্যানুসন্ধানের চিন্তাধারা ও অনুভূতি পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য-গন্ধী। আমি হয়ত ঠিক বোঝাতে পারছি না। 'উপসংহার' শীর্ষক শেষ অধ্যায়ে তিনি বলছেন:—

'বাস্তবিক, আমি মাঝে মাঝে ভাবি, আমি কি কারো প্রতিনিধিত্ব করছি,

আর কেউ কি ঠিক আমার মত ভাবে ? বোধ হয় না, যদিও জানি অনেকেই আমাকে বন্ধুভাবে দেখেন। আমি যেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এক অদ্ভুত সমন্বয়, কোনখানেই আমার যেন স্থান নেই, কোনখানেই আমার ঘর নেই। বোধ হয় আমার চিন্তাধারা ও জীবনদর্শন প্রাচ্যের মত নয় তাতে পাশ্চাত্যেরই ছাপ বেশী, কিন্তু তবু ভারতবর্ষ আমার অঙ্গে সস্নেহে জড়িয়ে আছে, তার অন্যান্য সন্তানদের মতই বিভিন্ন ভাবে। এবং আমার পিছনে হয়ত অচেতনভাবেই রয়েছে একশত বা তারো বেশী ব্রাহ্মণবংশের পুরাতন স্মৃতি। আমার সেই পুরাতন ঐতিহ্য বা নবাজিত এই ভাবধারা কোনটাকেই আমি ছাড়তে পারি না। দুটোই আমার সঙ্গে সস্নেহে মিশে রয়েছে, প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে উভয় এই আমি এর উপকারিতা অনুভব করি। কিন্তু এরাই আমার মধ্যে এক দুর্ব্বহ নিঃসঙ্গতার সৃষ্টি করেছে—কী কর্ম্মক্ষেত্রে, কী ব্যক্তিগত জীবনে আমি সর্ব্বদাই একাকীত্ব অনুভব করি। পাশ্চাত্যে আমি অপারিচিত বিদেশী, কখনই আমি পুরোপুরি পাশ্চাত্যের হতে পারি না। কিন্তু আমার নিজের দেশেও ত আমি স্বস্তি অনুভব করি না, এখানেও যেন আমি নির্ব্বাসিত।'

"বেশ সুন্দর চিত্তাকর্ষক এই স্বীকারোক্তি ! কিন্তু এ পড়লেই মনে হয়, তিনি যেন আর একটু গভীর ভাবে চিন্তা করে দেখেন নি—এই ভারতবর্ষ আসলে কী, যেটা তার সন্তানদের অঙ্গে সস্নেহে জড়িয়ে থাকে। সেটা কী ? এ সেই পরম জ্ঞানী, পরম সমৃদ্ধ, অধ্যাত্মবাদী ভারতবর্ষ যার ভগবৎ-প্রেমে উদ্ভূত হয়েছে রাজর্ষি, অমর মানুষ অমৃতস্য পুত্রাঃ। আমার ব্যক্তিগত দুঃখাবেগের বর্ণনায় আপনাকে হয়ত বিব্রত করছি, গুরুদেব ; কিন্তু আমি এই সুন্দর মানবাত্মাটিকে আন্তরিকভাবে ভাল বেসে ফেলেছি। সুভাষকে যেমন আপনার আশীর্ব্বাদ ও কল্যাণশক্তি দিয়ে উপকৃত করেছিলেন, তেমনি এঁকেও করুন— এ প্রার্থনা আপনাকে না জানিয়ে আমি পারছি না। আপনি তাঁর চিত্তে শান্তি এনে দিন। পরমপ্রশান্তি, ঈশ্বরাশীর্ব্বাদ প্রেমসম্ভূত যোগপ্রসূত যে প্রশান্তির কথা। ১৯৩২ সালে আমার সন্দেহনিরসনের জন্য আপনি বলেছিলেন, তার কথা আমি বলছি না। যে শান্তি দুর্জ্জের্য় তা দেওয়া যায় না, তাকে অর্জন করতে হয়, তার মধ্যে নিজেকে ক্রমশঃ অনুভব করতে হয়,—সে নয়। কিন্তু জওহরলাল

তার ত ছায়াপ্রকাশ অনুভব করতে পারেন। আপনার কৃপায় আমরা যখন সামান্য প্রয়াসেও তা পেয়েছি তখন তাঁর মত একজন পুরুষ পারেন না কেন? এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, ধ্যানমগ্ন এক বুদ্ধমূর্ত্তির সামনে দাঁড়িয়ে তিনি এই প্রশান্তির জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন। সুভাষ মাঝে মাঝে এই শান্তি অনুভব করেছে, যখন সে জেলে থাকত। বাইরে এসেই সে তা হারিয়ে ফেলত। যাক্, যা বলছিলাম।

"১৯৩৫ সালে গান্ধীজী আইনঅমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করলেন। জওহরলালের কাছে এর কারণ ঠিক পরিস্ফুট হয় নি, তাঁর মনে হল এ রহস্য মায়াবাদের থেকে উদ্ভূত। তিনি মায়াবাদে বিশ্বাস করেন না, তাই আত্মচরিতে নিঃসঙ্গতা শীর্ষক অধ্যায়ে লিখছেন:—

"একটা দারুণ আঘাতে আমার বহুবছরের পুরানো বিশ্বাসের তন্ত্রী যেন ছিঁড়ে গেল······আমি বুঝতে পারলাম কতগুলি বিষয়ে আমার যে স্পষ্ট ও দৃঢ় ধারণা ছিল সেগুলি তাঁর মতের সম্পূর্ণ বিপরীত। তা সত্ত্বেও অতীতে জাতীয় স্বাধীনতার জন্য কংগ্রেস যে সংগ্রাম করেছে তার প্রতি আনুগত্যের জন্য আমার এই ধারণাগুলিকে আমি কোনদিন বড় হয়ে উঠতে দিই নি। আমার মানসিক সংস্থায় মহৎ উদ্দেশ্য ও আমার সহকর্ম্মীদের প্রতি আনুগত্যের স্থান অনেক উঁচুতে, তাই আমি আমার নেতা ও সহকর্ম্মীদের প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখার চেষ্টা করেছি। আমার অন্তরের বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি থেকে আমায় সরে যেতে হচ্ছে এ বুঝেও, আমি সংগ্রাম করেছি নিজের মনের সঙ্গে, এই প্রতি আনুগত্যেরই জন্য। কোনরকমে আপোষ করে আমি চালিয়ে এসেছি এতদিন। হয়ত আমি ভুল করেছি, নিজের বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি থেকে চ্যুত হওয়া কারো পক্ষেই উচিত নয়। কিন্তু আদর্শের সংঘাত যখন এসেছে, আমি সহকর্ম্মীদের আনুগত্যটাকে জয়ী হতে দিয়েছি, আশা করেছি ঘটনার আবর্ত্তে ও সংগ্রামের কর্ম্মব্যস্ততার মধ্যে আমাদের এই বিভেদ দূর হয়ে যাবে, আমার সহকর্ম্মীরা আমার মতে ক্রমশঃ বিশ্বাসী হয়ে উঠবেন।

'কিন্তু এখন? আলিপুর জেলের মধ্যে বসে আমার অত্যন্ত নিঃসঙ্গ বোধ হচ্ছে— মনে হচ্ছে জীবন যেন একটা বিরক্তিকর শূন্যতা, নির্জ্জনতা। অনেক তিক্ত

অভিজ্ঞতা লাভ করেছি আমি, তার মধ্যে সবচেয়ে যেটা নিদারুণ ও বেদনাদায়ক সেইটারই এবার সম্মুখীন হতে হল আমাকে : মূলগত কোন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ে কারো ওপরই নির্ভর করা যায় না, মানুষকে জীবনের বিপদসঙ্কুল অরণ্য পথে একাই চলতে হয়। কারো উপর নির্ভর করার পরিণতি হয় অত্যন্ত মর্ম্মন্তুদ !'

"গুরুদেব, আমি এত বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম তাঁর এই স্বীকারোক্তিতে যে, আমার মনে হল তাঁকে আমি ডেকে আনি আমার এই সমুদ্রতীরের আবাসে কয়েকদিনের জন্য। কিন্তু সুভাষই যখন আসে নি, জওহরলালের আশা তখন দুরাশাই। তাছাড়া মহাভারতে বেদব্যাস বলেছেন 'কালেন সর্ব্বং বিহিতম্ বিধাত্রা'। হয়ত সে কাল মোহমুক্তির মধ্য দিয়ে খুব শীঘ্রং এগিয়ে আসবে। আপনিই একটা চিঠিতে লিখেছিলেন, 'উচ্চাশা, এবং তার জন্য মানসিক প্রয়াস, বা আদর্শবাদ—এই দুটি জিনষই মোহের সৃষ্টি করে। অধ্যাত্মবাদের পথ খানিকটা বাস্তববাদের উপরই নির্ভরশীল : প্রত্যেক জিনিষের আসন্ন মূল্য কী তা যাচাই করে নিতে হয়, এবং যাচাই করতে গেলে দেখা যায়, সেগুলি আসলে বিবর্ত্তনের এক একটা স্তর মাত্র।' সুতরাং জওহরলালকে আমায় ছেড়ে দিতে হল; তাঁর নির্দ্ধারিত পন্থাতেই তাঁর ভাগ্যের দর্শন মিলুক। তাকে এড়াবার যতই চেষ্টা করুক না কেন মানুষ, সেই পথেই সে এগিয়ে চলবে। আমাদের যে পথ বিশ্বাস আর শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ, সেই পথেই তাঁকে আসতে হবে, তাঁর বিধিনির্দ্দেশিত পথেই তিনি আসবেন।

"কিন্তু তাঁর ধর্ম্মগত সম্বন্ধে আপনার মতামত চাই আমি। প্রথমে তাঁর "ধর্ম্ম কী" শীর্ষক অধ্যায়টি পড়ুন, তারপর পড়ুন "নিঃসঙ্গতা," শেষের অধ্যায়ে, তাঁর জীবনের সব তিক্ততা, আর বিরক্তি তাঁকে ধর্ম্মের দিকেই ফিরিয়ে আনছে, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ক্রমশঃ ধর্ম্মপ্রবণ হয়ে উঠছে।

উপসংহারে তিনি বলছেন :

'চিন্তাধারার স্বচ্ছতা ও সুনির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য স্থির করার পক্ষে ধর্ম্ম কি পরিপন্থী নয়? আমি অনেকবার একথা ভেবেছিলাম—আবেগ আর অনুভূতিই তো ধর্ম্মের ভিত্তি। ধর্ম্মকে আধ্যাত্মিক বস্তু বলেই লোকে জানে, কিন্তু সত্যই কি তাই?

প্রকৃত অধ্যাত্মবাদ; মননশীলতা ও মানসিক দৃষ্টি তো ধর্ম থেকে আসে না। পরজগতই ধর্মের মূল লক্ষ্য ইহজগতের মানবতা ও সামাজিক ন্যায়-অন্যায়কে এড়িয়ে চলারই চেষ্টা করে। পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট ধারণাগুলির গণ্ডীর মধ্যে ধর্ম নিজেকে বন্দী করে রাখে, পাছে বাস্তবের রূঢ়তা তার এই ধারণাকে ভেঙ্গে দেয় এই ভয়ে।...তরবারির মধ্যে যে হিংসা আছে তাকে ধর্ম অস্বীকারই করে সত্য কথা। কিন্তু অহিংসার ছদ্মবেশে যে হিংসা মানুষকে অনশনে রাখে, তাকে হত্যা করে তিলে তিলে অথবা যখন শারীরিক ক্ষতির বদলে মানুষের আত্মাকে, ও তার মনকে হত্যা করে, তখন ধর্মের অনুশাসন কোথায় থাকে?' এই রকম আরো অনেক কথা আছে তাঁর উপসংহারে। 'হে রুদ্রদেব হে ধ্বংস-তাণ্ডবের প্রভু, তুমি কি মেঘলোক থেকে নেমে এসেছ ক্ষুব্ধ মানুষের মনের আবর্ত্তের মাঝখানে?'

এই চিঠির উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ লিখলেন, "দিলীপ, ধর্ম সম্বন্ধে আমার মত জহরলালের মত থেকে ভিন্ন। মানুষের অধ্যাত্মবাদ ও তার নিম্নতর স্বভাবকে উন্নততর করার প্রয়াসের মধ্যে যে অজ্ঞানতার পরিচয় থাকে, এই দুটি মিলিয়েই মানুষের সামাজিক ধর্ম গড়ে ওঠে। তাই এই সামাজিক ধর্ম সম্পূর্ণ ত্রুটীহীন নয়। আমার কাছে হিন্দুধর্ম একটা ধ্বংসোন্মুখ বিরাটকায় মন্দির; খুঁটিনাটিগুলি হয়ত হাস্যকর। কিন্তু তার মধ্যেও অর্থ নিহিত আছে। হয়ত এই বিরাট সৌধের কোন কোন স্থান ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে, কিন্তু তবু এর মধ্যে বসে অদৃশ্য সেই পরমেশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন চলতে পারে; যারা শুদ্ধ মনে আসে তারা এর মধ্যেই সেই পরমাত্মার অবস্থান অনুভব করতে পারে। বাইরের যে প্রাকার ও সামাজিক বহির্বাস তার কথা স্বতন্ত্র।"

তেইশ

এমনি একজন মানুষের সম্বন্ধে আমি সুভাষের কাছে মতামত চাইলাম। আমার ভয় হচ্ছিল, আমি যে মানুষটিকে সত্যই শ্রদ্ধা করি তার সম্বন্ধে

যদি সে তেমন কিছু বলে ফেলে? কিন্তু সন্দেহটাকে এড়িয়ে যাওয়ার চেয়ে তার নিরসনই ভালো এই ভেবে সাহস সঞ্চয় করলাম।

সুভাষ খানিকটা আমতা আমতা করে বলল: "জওহরলাল! আমার পক্ষে ঠিক বলা মুস্কিল। মানে, আমি কী ভাবে বলব আমার যা মনে হয়, ঠিক বুঝতে পারছিনা—"

আমার অন্তরে যেন তোলপাড় সুরু হয়েছে। সুভাষ আবার বলল—'হ্যাঁ কথাটা খুব শক্ত, কারণ তার সৌভাগ্যটা, যদিও একপক্ষে ঈর্ষার উদ্রেক করে, —তবু আমি ঠিক বুঝতে পারি না'—(সে যা বলতে চেয়েছিল, আমি ঠিক তারই পুনরাবৃত্তি করছি, ভাষাটা হয়ত আমার নিজস্ব হয়ে যেতে পারে কালক্রমে)

"সৌভাগ্য?"

সুভাষ ঘাড় নেড়ে বলল—'হাঁ'। কথাটার খেই টেনে নিয়ে সে এবার জোর করে বলতে লাগল—"আমাকে বলতে দাও। কথার মাঝখানে কোনো প্রশ্ন কোরো না তুমি। রাগ কোরো না দিলীপ, যা বলতে চাই তা যদি ঠিক বোঝানো না যায় অর্থাৎ যা বল্লাম তাতে ঠিক আমার অন্তরেরর কথাটা ব্যক্ত হ'ল কিনা—এটা একটা শক্ত ব্যাপার নয় কি?"

আমি বল্লাম—"কিন্তু তুমি এসব কী বলছ সুভাষ! এ ত মনস্তত্ত্বের কথা! হাতে হাত দাও বন্ধু।"

আমার হাতটায় একটু চাপ দিয়ে হেসে সে বলতে লাগল: "নীতিবাদী যখন শিল্পীকে প্রভাবিত করতে যান, তখন তিনি নিজেও শিল্পীর দ্বারা খানিকটা প্রভাবিত হয়ে পড়েন। ভক্ষক নিজেই ভুক্ত হয়ে পড়েন।"—তারপর আরো স্পষ্টভাবে সে বলল—"হ্যাঁ, জীবনে একটা বেশ শিক্ষালাভ করেছি: ঠিক কথা বলতে পারাটা শুনতে যতটা ভালো লাগে তার চেয়ে কাজে অনেক বেশী কঠিন। যাই হোক্, এখন শোনো মনোযোগ দিয়ে…" সে হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে উঠল, তারপর বলতে শুরু করল—"তিনি যতটা খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করেছেন, সাধারণ মানুষের পক্ষে অতটা উর্দ্ধে ওঠা কখনই সম্ভব নয়—একথা সকলকেই মানতে হবে। তাঁর

মেধা ; অন্তর্দৃষ্টি এবং লেখার ক্ষমতা যে অসাধারণ, এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। তোমার মত বীরের পূজারীকে কাছে তাঁর অসংখ্য গুণাবলীর ফিরিস্তি দিয়ে আর লাভ কি ?"

"দেখো সুভাষ, আসামীকে শূলে চড়ান যখন সাব্যস্তই হয়ে গিয়েছে তখন আর তাকে গালাগালি দিয়ে লাভ কি ? চিত্তরঞ্জন দাশের যখন প্রশংসা করি তখন ত বীরের পূজারী বলে ঠাট্টা করো না, তখন বরং তোমার ভালই লাগে। কিন্তু জহরলালের একটু প্রশংসা করলেই অমনি— "

সে হেসে উঠে বলল, "এইবার ধরা পড়ে গেলে তুমি। চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে যখনি ওঁর তুলনা করতে লেগেছ তখনই তোমার মোকদ্দমা খারাপ হয়ে গেল—"

"না না, না সুভাষ, এটা ঠিক ন্যায় বিচার হচ্ছে না। কখন আমি বল্লাম যে জহরলাল চিত্তরঞ্জন দাশের সমান ?"

হাসতে হাসতে সে বলল—"ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ দিলীপ। তুমি একটা পাষাণভার নামিয়ে দিলে আমার বুক থেকে। এখন আমি মন খুলে কথা বলতে পারব, তুমি যা জানতে চাও শোনো।"

আমার তিনবার 'না' বলার মত ওরও তিনবার ধন্যবাদ দেওয়ায় আমি হেসে ফেল্লাম।

সেও হাসতে হাসতেই বলল—"আমি তিনবার ধন্যবাদ দিলাম কেন জানো, আমি তোমার কথায় তিনগুণ খুশী হয়েছি। তোমার পূজনীয় বীরের সংখ্যা অনেক, তার মধ্যে আবার একটা যদি বাড়াতে, তাহ'লেই আমার পক্ষে আর উপায় ছিল না। যাই হোক্, আর হাসি নয়—জহরলাল প্রসঙ্গটি সত্যিই হাসির বস্তু নয়।"

"সে কথা আমি জানি। বিশেষ করে যখন দেখি ধর্ম্ম কী সেটা ভাল করে না জেনেই তিনি ধর্ম্ম সম্বন্ধে কথা বলেন, তখন বিষয়টা শুধু গুরুতরই নয়, অস্বস্তিকরও বটে।"

সুভাষ খানিকটা কঠিনভাবেই বলল—"এ বিষয়ে আমি তোমার সঙ্গে একমত নই। কোন জিনিষের ভিতরে প্রবেশ না করে মতামত প্রকাশ করলে তা

ভাসাভাসা ত হবেই। জহরলাল বা কোন সাম্যবাদী ধর্ম্ম সম্বন্ধে গভীর একটা তত্ত্বকথা বলবেন এ আশা করাও যা, আর কোন উদারপন্থী দেশ-প্রেমিক তরুণদের আত্মোৎসর্গে উৎসাহ দেবেন, এ আশা করাও তাই। দুটোই অসম্ভব। না, আমি জহরলালের ওপর অবিচার করছি না। ধর্ম্ম মানুষের কী উপকার বা অপকার করেছে এ নিয়ে তিনি যখন মতামত দেন, তখন তিনি একজন নিরাসক্ত বিদেশীর মতই সমালোচনা করেন। সেইজন্য তাঁর মতামতের মধ্যে নূতন কোন কথা থাকে না। ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁর সমালোচনা কোন গভীর অভিজ্ঞতালব্ধ নয়, তার ভিত্তি শুধু সামাজিক ফলাফলের ওপর।"

"ঠিক ধরেছ তুমি সুভাষ। যদিও ধর্ম্মের অভিজ্ঞতা সমাজকে প্রভাবিত করেছে, ধর্ম্ম আসলে কোন সামাজিক বিকাশ নয়; সমাজবদ্ধ মানুষের যে কোন অভিজ্ঞতা শেষ পর্য্যন্ত সমাজের কোন উপকারে বা অপকারে আসে, এই পর্য্যন্ত। জহরলাল এই অত্যন্ত সরল কথাটা বুঝতে পারেন না, কারণ তিনি ধর্ম্মের মূলে মোটেই প্রবেশ করার চেষ্টা করেন নি। সেইজন্যই ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁর কীর্ত্তিগুলি আমার কাছে অস্বস্তিকর মনে হয়, কারণ অনেকেই বুঝতে চান না যে এক বিষয়ে জ্ঞানী হলেই, মানুষ সব বিষয়েই জ্ঞানী ও মহৎ হয়ে ওঠে না।"

"কিন্তু 'অস্বস্তিকর' বললে কেন, দিলীপ? শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত তুমি, তোমার ত বোঝা উচিত যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি যা বলে গিয়েছেন তাই চূড়ান্ত; এরকম ধরণের হাজারটা সমালোচনাও তার ওপর বিন্দুমাত্র আঘাত করতে পারবে না। না, জহরলালের মতের মূল্য আছে বটে, কিন্তু সে এক্ষেত্রে নয়, এখানে তাঁর প্রবেশ নিষেধ।"

"কোন্ ক্ষেত্রে তবে—?"

"কেন, রাজনীতি, সমাজ-সংগঠন, দেশপ্রেম, নীতিবাদ, সাম্যবাদ, বিজ্ঞান—অনেকই ত রয়েছে। এই সব বিষয়ে যখন তিনি কথা বলেন, যদিও তোমার মতে না-ও মেলে, তবুও তা শোনার মত। তাছাড়া তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে লোককে মুগ্ধ করার ক্ষমতা আছে একথা সত্যি। যদিও শুধু মুগ্ধ

করার ক্ষমতা থাকলেই নেতা হওয়া যায় না—না, দাঁড়াও আমার কথা এখনো শেষ হয় নি, শোনো। তাঁর অন্য কোন ক্ষমতা যে নেই একথাও আমি বলছি না। কিন্তু এখুনি তোমাকে যা বলছিলাম তিনি যে এতটা উঁচুতে উঠে যেতে পেরেছেন তার মূলে রয়েছে তাঁর ভাগ্য। ভাগ্যদেবী সত্যই সুপ্রসন্না তাঁর ওপর।"

"ভাগ্য ?"

"ভাগ্য ছাড়া তাঁর অসাধারণ জনপ্রিয়তার আর কি কারণ থাকতে পারে ? সবারই মন জুগিয়ে চলতে পারেন তিনি, তাই সবাই তাঁকে চায়। তাঁর যদি আন্তরিকতা আর ন্যায় নিষ্ঠা না থাকত তাহলে বলতাম—বরের ঘরের মাসী ক'নের ঘরের পিসী। কিন্তু তবু,…একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে…যদিও ব্যাপারটা আজকের জগতে খুবই আশ্চর্য্য …ভারতবর্ষের সবাই সবক্ষেত্রে সব বিষয়েই মনে করে জহরলালই অভ্রান্ত পথ প্রদর্শক, শ্রেষ্ঠ উপদেষ্টা। অথচ আরো আশ্চর্য্যের বিষয় তিনি নিজেই স্বীকার করেন যে পদে পদে তাঁর ভুল হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও কৃষকরা বলে তিনিই তাদের মুখপাত্র, শ্রমিকরা অভিনন্দন জানায় তাদের নেতা বলে, সাম্যবাদীরা তাঁকে সমর্থন করে, বনিকরা 'জহরলাল' বলতে অজ্ঞান। কথাশিল্পীরা মনে করেন বেলে্‌-লেটার্সের প্রথম পথপ্রদর্শক তিনিই, আবার মিল মালিকরা তাঁর পিছনে ছোটেন—যদিও তিনি নিজে সূতা কাটেন, (অবিশ্বাসের সঙ্গেই) গান্ধীজীর উপযুক্ত উত্তরাধিকারী হবার আগ্রহে।"

"তোমার মোট কথা ত এই যে জহরলালের চরিত্রের অনেকগুলি দিক আছে। কিন্তু তাতে দোষ কি ? বিভিন্ন সংগঠন আর ভিন্ন চরিত্রের অনেক লোকই তাঁকে পছন্দ করে, এর জন্য তাঁর দোষ দেওয়া যায় না। তাঁর পক্ষে নাগপুরের ট্রেড্‌ইউনিয়ন কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করা কি অন্যায় হয়েছিল ? তিনি অবশ্য কোন কাজে আসেন নি; এইটাই তোমার তর্কের মূল বস্তু বোধ হয়। তা যদি হয়, তাহলে তাঁকে যে বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করার জন্যও লোকে ধরাপাড়া করছে, সেখানেও ত তিনি বিশেষ কোন কাজে আসেন নি ? তারপর তোমার কথা হল,

গান্ধীজীর প্রতি ভক্তির আতিশয্যে নিজে বিশ্বাস না করলেও, তিনি সূতো কাটেন। এটা বরং একটা অভিযোগের কারণ হতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে আমার কথা হলো, জহরলাল গান্ধীজীকে সত্যই শ্রদ্ধা করেন, ভালবাসেন, আমরা যারা তাঁকে ঠিক সেভাবে ভালবাসি না তারা একথা কি করে বুঝব? ভাল না বাসলে ভালবাসার মর্ম্ম কি বোঝা যায়! আমার নিজের ব্যাপারটাই ধরো না কেন। শ্রীঅরবিন্দ আর রাসেল দুইজনে দু'ধরণের ব্যক্তি—একজনের মূল ভক্তিবাদ আর একজনের যুক্তিবিচার। অথচ আমি দুজনকেই ভালবাসি এর জন্যে শ্রীঅরবিন্দের ভক্তরা ও রাসেল-ভক্তরা দুইদলই আমাকে গালাগালি দেয়। কিন্তু আমি ভাল না বেসে পারি না—ভালবাসাকে ত জোর করে সংযত করা যায় না?"

সুভাষ একটু হেসে বলল—"কিন্তু তুমি গোড়াতেই একটা মস্ত ভুল করে বসেছ, দিলীপ। নীতিবাদ বা চিন্তারাজ্যে, যেখানে রাজনীতির মত সব সময় কর্ম্মের প্রয়োজন হয় না সেখানে, নিজের মত বা ধারনা নিয়ে চলার মধ্যে কোন আপত্তির কারণ থাকতে পারে না। কিন্তু যদি তোমার কর্ম্মের ফল বহুলোককে, জনসাধারণকে প্রভাবিত করে,—রাজনৈতিক নেতার ক্ষেত্রে তা হবেই, কারণ সেইটাই তার উদ্দেশ্য—তাহলে আমি বলব, সমাজজীবনে নিজের খেয়ালখুশী মত চলা তোমার উচিত নয়! আমি জানি যে সব সময় আমরা ঠিক একভাবে চলতে পারি না। আমাদের মতের ও পথের পরিবর্ত্তন স্বাভাবিক। কিন্তু কর্ম্মীর জীবন যাপন করতে হলে, প্রত্যেকেরই তার নিজের মনের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে নেওয়া উচিত; এবং এমনভাবে তার চলা উচিত যাতে মোটামুটি কোন সংঘর্ষ না ঘটে বা বিশেষ পরিবর্ত্তন না আসে। অর্থাৎ কর্ম্মজীবনে একটা সামঞ্জস্য রেখে চলার অত্যন্ত প্রয়োজন আছে, যদিও একেবারে অভ্রান্ত হতে হবে এমন কথা কেউ জোর করে বলতে পারে না। তা যদি না হয় তাহলে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে। প্রত্যক্ষ রাজনীতিটা অভিনয়ের মঞ্চ নয়, ঘণ্টায় ঘণ্টায় রূপ পরিবর্ত্তনের স্থানও নয়। রাজনৈতিক কর্ম্মী যদি তিনদিন অন্তর মত বদলায় তাহলে বিপর্য্যয়ের ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। শিল্পী হিসাবে তোমার রাসেলের প্রতি

আনুগত্য থাকতে পারে, আবার শ্রীঅরবিন্দের শিষ্য হওয়াও তোমার পক্ষে মোটেই অশোভন নয়। তোমার ব্যক্তিত্বের হয় তো উন্নতিই হতে পারে; অবশ্য এবিষয়ে আমি বিশেষ কিছু জানি না; তোমাদের 'মায়া' বা শিল্প সম্পর্কে মতবাদ আমার কাছে সবই অজ্ঞাত। কিন্তু আমি জানি সাধারণের স্বার্থে যে রাজনীতি তার মধ্যে শিল্পকলার চেয়ে সংগ্রাম ও কর্ম্মের স্থানই প্রকট। শিল্পীর কাছে যেটা খেলা, সেটা রাজনৈতিকের কাছে মৃত্যু হওয়া কিছুই অস্বাভাবিক নয়। আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি। এই ঘটনাটায় আমি খুব একটা আঘাত খেয়েছিলাম। তুমি ভালভাবেই জানো যে লোকে আমাকে ও জহরলালকে দুজনকেই বলে অত্যন্ত উগ্রপন্থী, কারণ আমরা দুজনেই পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী করি। পূর্ণ স্বাধীনতাই আমরা চেয়েছি। কিন্তু মনে করে দেখো এই জহরলালজীর সভাপতিত্বেই ১৯২৯ সালে লাহোর কংগ্রেসে কী ঘটল। সব দলের নেতারা মিলে এমন একটি প্রস্তাব পাশ করলেন যার অর্থ হলো পরিপূর্ণ সহযোগিতা—রাজপ্রতিনিধির গোলটেবিল বৈঠকের প্রস্তাবটায় তাঁরা রাজী হয়ে গেলেন। গোলটেবিল বৈঠকে কী ঘটবে তা সবাই তাঁরা জানতেন—তাঁরা কেউ এমন নির্ব্বোধ ছিলেন না, যে এই ভাঁওতায় ভুলে যাবেন—অন্ততঃ জহরলাল ত ননই। আর যাই হোক্ তাঁর শত দোষ সত্ত্বেও একথা স্বীকার করতেই হবে যে, এটুকু দূরদর্শিতা তাঁর ছিল। তুমি জানো পরিণামে কি হয়েছিল। কংগ্রেসের আপোষ করতে হলো মুষ্টিমেয় উদারপন্থীর কাছে—তাদের অগ্রাহ্য করার মত শক্তি তখন কংগ্রেসের যথেষ্টই হয়ে ছিল। অথচ এই উদারপন্থীদের স্বরূপ তিনি তাঁর আত্মচরিতে কী ভাবে খুলে ধরেছেন নিজেই। ডোমিনিয়ন স্টেটাসের ভিত্তিতে আমরা সহযোগিতা করতে রাজী, এই কথাটাই ঘোষণা করা হলো লাহোর কংগ্রেসে। তিলক বলতেন স্বরাজ আমাদের জন্মগত অধিকার। সেই জন্মগত অধিকার স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করা হলো—শুধু একটা ক্ষণস্থায়ী সুবিধার লোভে, এমন কি সে সুবিধা সম্বন্ধেও সন্দেহের যথেষ্ট কারণ ছিল। কোথায় যেন পড়েছিলাম রাতকানা একটা লোক অন্ধকার ঘরের মধ্যে একটা কালো বিড়ালকে দেখতে পেয়েছিল। আমাদের ছিল অমনি

ধরণের একটা কিছু অবিশ্বাস্য ব্যাপার। আদর্শকে বলিদান করে আমরা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। জহরলাল তাঁর 'আত্মচরিতে' নিজেই তা স্বীকার করেছেন। আমি সেই ইস্তাহারে সই করতে অস্বীকার করি, জহরলালও প্রথমটা রাজী ছিলেন না। কিন্তু বুঝিয়ে সুজিয়ে তাঁকে শেষ পর্য্যন্ত রাজী করা হয়েছিল—যা তিনি অন্যায় ও বিপজ্জনক বলে ভাল ভাবেই বিশ্বাস করেছিলেন, তাতে সই দিলেন কেমন করে? বালকের মত তিনি যে যুক্তি দেখিয়েছিলেন এই সই দেওয়ার স্বপক্ষে, তা হয়ত তোমার মনে আছে?"

তার কথায় খানিকটা বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম ইতিমধ্যেই, তবু মিনতি ক'রে বল্লাম! "অতটা কঠোর হয়ো না, সুভাষ! তুমি ত জানো তোমার মত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আমি জহরলালের আত্মচরিত পড়িনি। তোমার মত সমালোচকের অন্তর্দৃষ্টি আমার নেই। আমি দেখেছি তাঁর ব্যক্তিত্বটাকে, তাঁর কর্ম্মজীবনের সফলতা-ব্যর্থতা আমি খুঁটিয়ে দেখিনি। তোমার কাছে যা শুনছি তাতে সত্যিই খানিকটা বিচলিত হয়েছি। কিন্তু তবু ঠিক আপোষকামী বা সুবিধাবাদী রাজনীতিক বলে তাঁকে মনে করতে পারিনা।"

সুভাষ সায় দিয়ে বলল—"আমিও অবশ্য তা করিনা। সেইজন্যই ত আমি গান্ধীজীর হাতে গড়া পুতুলরূপে তাঁকে দেখতে চাইনা। এই যে এখনি বলছিলে গান্ধীজীর প্রতি তাঁর অকপট শ্রদ্ধার কথা,-তা তিনি গান্ধীজীকে শ্রদ্ধা করুন, ভক্তি করুন আন্তরিকভাবে, তাতে আমার বলার কী থাকতে পারে? কিন্তু ব্যক্তিগত আনুগত্যের জন্য নিজের মতবাদকে বিসর্জ্জন দেওয়া বিশেষ করে একজন রাজনীতিকের পক্ষে অমার্জ্জনীয় অপরাধ। গান্ধীজীর নিজের কথাই ধরো না কেন। উনি ত গোখেলকে কম শ্রদ্ধা করতেন না। কিন্তু আদর্শের সংঘাত হলে তিনি নিজের মতটাকেই উঁচু করে ধরতেন। দেখো দিলীপ, শিল্পীর পক্ষেই সৌন্দর্য্য সামঞ্জস্যটা শোভন হয়। সুন্দর একটা সৃষ্টির জন্য আপাতবিরোধগুলিকেও সে মেনে নিতে পারে। কিন্তু একজন কর্ম্মীর পক্ষে, রাজনীতিকের পক্ষে, দেশ বিখ্যাত একজন রাষ্ট্রনেতার পক্ষে মেরুদণ্ডহীন হওয়াকে পাগ্‌লামি ছাড়া আর কী বলতে পারি?"

আমি একটু থেমে আস্তে আস্তে বললাম! "তুমি সত্যই আমাকে ভাবিয়ে তুলেছ সুভাষ। এর আগে কখনো ভাবতেই পারিনি জহরলালের পক্ষে তুমি যা বলেছ, তা হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু একটা প্রতিবাদ আমি করবো যদিও তোমার যুক্তির কাছে সেটা ক্ষীণই শোনাবে। দু'পক্ষেই অনেক কিছু বলার থাকতে পারে—স্যার রোজার কোভার্লির এই কথাটা নিশ্চয়ই ভোলোনি? হয়ত কথাটাকে তুমি আমল দেবে না এক্ষেত্রে। বল্‌বে, শিল্পের সাহায্যে যে কোন দিককেই সুন্দর দেখাবার শিল্পীর একটা সাধারণ লোভ থাকে,—সেটা দুর্ব্বলতা ছাড়া আর কিছু নয়।"

"যদি সেটা শিল্প হয় তাহলে তাকে উড়িয়ে দেব না আমি। কিন্তু শিল্পীকে বলবো তিনি যেন রাজনীতি নিয়ে ছেলেখেলা করতে না আসেন। পরধর্ম্ম সব সময়েই 'ভয়াবহ'—গীতার কথা ভুলে যেওনা। জহরলাল যদি শিল্পীর মত সবদিকেই উদার মন নিয়ে চলতে চান, অর্থাৎ বিরোধী পক্ষের পথের মধ্যেও যুক্তির সারবত্তা খুঁজে নিয়ে আত্মসন্তোষ লাভ করতে চান, তাহলে তাঁর পক্ষে রাজনীতি ছেড়ে শিল্প চর্চ্চা করাই সমীচীন। তাঁর সাহিত্যপ্রতিভা সত্যই অনন্যসাধারণ। তিনি সাহিত্যকেই ত তাঁর 'স্বধর্ম্ম' করে নিতে পারেন?"

"কেন করেন নি, বলো ত দেখি?"

সুভাষ হাসলো আমার কথা শুনে। "বেশ বলেছ, দিলীপ পারলাম না এর উত্তর দিতে। আমার কাছে তিনি একটা দুর্ব্বোধ্য প্রশ্নই রয়ে গেছেন এখনো পর্য্যন্ত। পুতুল পূজার বিরুদ্ধে কী তাঁর তীব্র প্রতিবাদ, অথচ গান্ধীজীর কাছে তিনি সর্ব্বদাই নতজানু। অবশ্য প্রতিবাদ আছে, তর্ক আছে, কিন্তু সে নিষ্ফল। তার উপর রাশিয়া-পূজার প্রবর্ত্তনও তিনি করতে চান! দাঁড়াও, এখনো শেষ হয়নি আমার। গান্ধীপূজা আর মস্কোপূজা অবশ্য এক পর্য্যায়ের নয়—এত বোকা নই আমি—পার্থক্যটা ধরার মত বুদ্ধি আছে আমার দিলীপ। মস্কোপূজা করেন তিনি মস্তিষ্ক দিয়ে, আর গান্ধীপূজা করেন হৃদয় দিয়ে। প্রতিবাদগুলো শুধু এই পূজাটীকে স্বাভাবিক দেখাবার জন্য। কিন্তু দেখো দিলীপ, জনসাধারণকে যখন পথ দেখানোই তোমার কর্ত্তব্য, তখন একই সঙ্গে হিংসা আর অহিংসা, দুটো বিরোধী মতবাদকে সমর্থন করা চলে না।

কর্ম্মক্ষেত্রে নেমে এসে দুদিক বজায় রাখা অসম্ভব। যে কোন একটা পথ তোমায় বেছে নিতেই হবে। না, দিলীপ, জহরলালকে প্রশংসা তুমি করতে পার, প্রশংসার যোগ্য অনেক গুণই আছে; কিন্তু একটা ভবিষ্যদ্‌বাণী আমি করছি—যদি তিনি সত্যই রাজনীতিক হিসাবে ভারতবর্ষের সেবা করতে চান, তাহলে তাঁকে আগে তাঁর মত-স্থির করতে হবে। পায়ের নীচের দাঁড়াবার জমি যদি তাঁর ঠিক না থাকে, তাহলে জমি এসে তাঁর পায়ের তলায় দাঁড়িয়ে থাকবে না : ফলে হবে এই যে, কোন সময়েই তিনি সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবেন না।”

চব্বিশ

রাজনীতিক জহরলাল সম্বন্ধে কোন আলোচনা করার সাহস আমার নেই, কারণ রাজনীতিক আমি নই, সে সম্বন্ধে কিছু বলা আমার পক্ষে বাতুলতাই হবে। সে অধিকার সুভাষের ছিল, সে ছিল রাজনৈতিক কর্ম্মী। সাধারণভাবে যেটুকু রাজনীতি আমি বুঝি, সেইটুকুর ভিত্তিতে বলতে পারি, জহরলালের আন্তরিকতা ও মহানুভবতাকে আমি শ্রদ্ধা করি, তাঁর সম্বন্ধে কঠোর কোন সমালোচনা আমার বিবেকের পক্ষে অস্বস্তিকর। আমার দুঃখ শুধু এইখানেই যে প্রায় বিশ বৎসর গান্ধীজীর মত গুরুর কাছে থেকেও তিনি ধর্ম্ম সম্বন্ধে এত তীব্র বিরুদ্ধ ধারণা পোষণ করেন। সুভাষের সঙ্গে যখন তাঁর তুলনা করি তখন এই পার্থক্যটা আরো বেশী করে লাগে; রাজনীতিক হলেও সুভাষের এই আধ্যাত্মিক দিকটা নষ্ট হয়ে যায় নি একেবারে। এই রকম একটা তুলনামূলক সমালোচনার মধ্য দিয়ে আমি সুভাষের যে দিকটা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি, সবসময় তার সে দিকটা ঠিক প্রকাশ পেত না, একথা সত্য। কঠোর আত্মসমীক্ষণ ও শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে ব্যক্তিত্ব যখন আদর্শের একটা উচ্চতম শিখরে পৌঁছাতে পারে, তখনই কেবল এই অপূর্ব্ব সামঞ্জস্যটির প্রকাশ পাওয়া সম্ভব। চরিত্রের এই পরিপূর্ণ সঙ্গতির স্তরে পৌঁছানর আগে পর্য্যন্ত অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্য স্বাভাবিকই। দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের মধ্য দিয়েই চরম পরিণতির

দিকে এগিয়ে যায় মানুষের চরিত্র—এইখানেই গুরুর প্রয়োজন। মানব-চরিত্রের বিবিধ আকর্ষণ ও দ্বন্দ্বের বন্ধন এড়িয়ে তাকে পরিপূর্ণ সঙ্গতির দিকে নিয়ে যাওয়াই গুরুর কাজ। জেলের মধ্যে সুভাষ এই দিকটা অনুভব করত মর্ম্মে মর্ম্মে। শ্রীভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলেছেন: "সন্তো দিশান্তি চক্ষূংষি বহিরার্কাঃ সমুত্থিতাঃ" (১১-২৬-৩৪)
এটা শুধুই কবির কল্পনা নয়। একে সম্ভব করে তুলতে গেলে প্রার্থীকে হতে হবে দীন, বিনয়ী, নম্র। যীশুখ্রীষ্ট বলেছেন: 'যাহারা নিজকে দীন বলিয়া মনে করে তাহারাই পবিত্র, স্বর্গরাজ্য তাহাদের জন্যই।' (জহরলাল হয়ত বলবেন; ধর্ম্ম চরিত্র সৃষ্টিকে ব্যাহত করে আত্মার দীনতার এই অনুশাসনে।) মহাভারতে আছে, 'ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্'। সুভাষ সময় সময় অনুভব করত এর সত্যতা, মনটা যখন তার নিঃসঙ্গ কর্ম্মহীন অবসরের মধ্যে বিষণ্ণ আর উদাসীন হয়ে উঠত। কিন্তু জহরলাল তা পারেন না, অন্তরের এই নিহিত সত্য তাঁর মনের তীব্র আলোক সত্ত্বেও অপ্রকাশিতই রয়ে আছে এখনো। গুরুবাদের প্রথম একটা অনুশাসনেই আছে শিষ্যকে গুরুর আদেশ বিনা বিচারে বিনা দ্বিধায় মানতে হবে।
আমার মনে হয় এই অধ্যাত্মবাদ থেকে সুভাষের হঠাৎ প্রত্যাবর্ত্তনের কারণ এইখানেই। আমি তখন খুব ব্যথিত হয়েছিলাম, কিন্তু পরে বুঝতে পারলাম চরিত্রের মধ্যে যে অহং ভাবটা থাকে সেটা যখন খুব বেশী চাপ খায় তখন এই ধরণেরই একটা কিছু ঘটে যায়। বিচারবুদ্ধি দিয়ে যার কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না, এরকম হঠাৎ একটি বিদ্রোহের মূল থাকে এরই মধ্যে। সুভাষের চরিত্রে সব সময় সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায় না, শুধু এই কারণেই।

পঁচিশ

১৯২৪ সালে চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে স্বরাজ্য পার্টি কলকাতার পৌরসভা দখল করল। এপ্রিল মাসে সুভাষ প্রধান কর্ম্মকর্ত্তার (**Chief Executive Officer**) পদে নিযুক্ত হল। খুব যোগ্যতার সঙ্গেই সে কাজ করেছিল ঐ

পদে। কিন্তু অক্টোবরেই 'রেগুলেশন থ্রি'র দয়ায় সে গ্রেপ্তার হল। 'রেগুলেশন থ্রি'কে লোকে তখন বলত 'বেআইনী আইন' কারণ এই আইনে অভিযুক্তেরা আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ ত পেতই না, এমন কি অপরাধটি কী তাও জানবার কোন উপায় ছিল না। সুভাষকে প্রথমে নিয়ে যাওয়া হলো আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে, তারপর বহরমপুর, তারপর মান্দালয়ে। মান্দালয়ে আসার পর তার শরীর ভেঙ্গে পড়ল।

তার ভীষণ একটা দুরারোগ্য রোগ হয়েছে, এই ধরণের কিছু কিছু কথা আমাদের কানে আসতে লাগল—অথচ আমাদের করবার কিছুই ছিল না। আমি চিঠিপত্রে ধর্ম্ম সম্বন্ধে তার সঙ্গে আলোচনা করতাম—যোগ অভ্যাসের ফলে আমি কী পেয়েছি এমনি সব অনেক কথা। আমার মনে হত তার দ্বারা হয়ত সে অনেকটা শান্তি পাবে। সেও তার উত্তর দিত চমৎকার ভাবে। একটা চিঠিতে সে লিখেছিল।

"শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে তুমি যা লিখেছ তার প্রায় সবটা সম্বন্ধেই আমি একমত। তবু দুএকটা বিষয়ে আমার ধারণা ঠিক তোমার মত নয়। শ্রীঅরবিন্দ ধ্যানী পুরুষ, তাঁর গভীরতা বিবেকানন্দের চেয়েও কোন কোন ক্ষেত্রে বেশী; যদিও বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আমার শ্রদ্ধা অত্যন্ত প্রগাঢ়। আমি তোমার সঙ্গে একমত যে মানুষের পক্ষে নির্জন ধ্যানের প্রয়োজন আছে, কোন কোন সময় এই ধ্যানের কাল বেশী হওয়াও অবাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু এতে একটা বিপদ আছে; বেশীদিন সমাজের জীবনযাত্রা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকলে কর্ম্মযোগের দিকটা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যাঁরা অসাধারণ প্রতিভাশালী সাধক তাঁদের কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে কর্ম ও সেবাই সর্বত্র প্রধান ভিত্তি হওয়া উচিত।"

১৯২৮ সালে যখন সর্ব্বপ্রথম আমি আশ্রমের নির্জন নিঃসঙ্গতার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছিলাম তখন নির্জনতা ও মানবসেবা সম্বন্ধে আমার ধারণা ছিল প্রায় তারই মত। তারপর ক্রমে ক্রমে যখন আমার জীবনাদর্শের পরিবর্ত্তন ঘটল, তখন এই ধরণের ঐহিক বিচারবুদ্ধি আমার কাছে আর অভ্রান্ত মনে হল না। আমি তখন অনুভব করলাম শ্রীরামকৃষ্ণের অনুশাসনের সেই

স্বচ্ছতা—ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ ছাড়া কাজ করা বা মানুষের সেবা করার প্রচেষ্টা সার্থক হতে পারে না। তার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফলে আমি এটাও বেশ বুঝতে পারলাম যে গুরুর সঙ্গ ছাড়া এই অন্তরের আদেশ শোনা যায় না—মানবপ্রকৃতির অহং ভাব তাকে প্রবঞ্চিত করে। আমি সুভাষকে একথা লিখে জানিয়েছিলাম; কখনও সে আমার কথা মেনে নিত, কখনও বা প্রতিবাদ জানাত। কিন্তু মেনে না নিলেও, আমি লক্ষ্য করতাম যে কারাবাসের নির্জন অবসরের মধ্যে তার আত্মমুখীনতা ক্রমশঃ গভীরতা লাভ করছে। মাদ্রাজ কারাবাস থেকে সে ১৯৩২ সালে যে চিঠি লেখে, তাতে এই কথাটা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু জেলের মধ্যে তার স্বাস্থ্য কখনই ভাল থাকত না। এ বিষয়ে সে ছিল জহরলালের ঠিক বিপরীত। অনেক দিন ধরেই তার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে একটা কথা শোনা যাচ্ছিল, শেষ পর্য্যন্ত কথাটা আমাদের সত্যিই ভাবিয়ে তুলল: ডাক্তাররা টি-বির পূর্ব্বলক্ষণ বলে সন্দেহ প্রকাশ করলেন। পত্রিকাগুলি প্রচণ্ড গণ্ডগোল সুরু করল—তার ওজন প্রায় ৪০ পাউণ্ড কমে গিয়েছে। বাংলা সরকারের স্বরাষ্ট্রসচিব বিব্রত হয়ে তাকে জানালেন, ইচ্ছা করলে চিকিৎসার জন্য সে সোজা ইউরোপে চলে যেতে পারে মাদ্রাজ থেকে, কিন্তু কলকাতা বা ভারতবর্ষের অন্য কোন বন্দরে তার যাওয়া চলবে না। এ ধরণের সর্ত্ত মানবার ছেলে সুভাষ নয়—সে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল।

ঠিক এই সময়েই হঠাৎ চিত্তরঞ্জন দাশ মারা গেলেন—১৯২৫ সালের মে মাসে। সুভাষ অত্যন্ত আঘাত পেয়েছিল চিত্তরঞ্জন দাশের এই অকাল মৃত্যুতে। মান্দালয় থেকে সে আমাকে লিখল (২৫—৬—২৫):

"কোন্ চিন্তা আজ আমাকে ব্যাকুল করে তুলেছে, তা তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ। আমার মনে হয় আজ আমাদের সবার মনেই একই চিন্তা—দেশবন্ধুর মৃত্যু। যখন প্রথমে খবরটা পড়লাম, নিজের চোখকে আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। কিন্তু এ ত মিথ্যা নয়, নিদারুণ কঠোর সত্য এই সংবাদ। আমাদের জাতটা সত্যই কি দুর্ভাগা!"

এর পর থেকে তার স্বাস্থ্য আরো তাড়াতাড়ি খারাপের দিকেই যেতে

লাগল—শেষ পর্য্যন্ত ১৯২৭ এর মে মাসে স্বাস্থ্যের অজুহাতে তাকে বিনাসর্ত্তে মুক্তি দেওয়া হল।

কিন্তু কতদিনই বা সে বাইরে ছিল! ১৯৩০ সালের জানুয়ারী মাসে রাজবিদ্বেষ প্রচারের অপরাধে তাকে আবার জেলে যেতে হল, এবার ৯ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড। এই বছরই অগাস্ট মাসে বন্দী অবস্থাতেই সে কলকাতার মেয়র নির্ব্বাচিত হল। পরের মাসে সে ছাড়া পেল, কিন্তু আবার পরের বছরই বন্দী হল, ১৮১৮র তিননম্বর রেগুলেশন অনুযায়ী। এবার স্বাস্থ্য এমনভাবে ভেঙ্গে পড়ল যে একবছর পরে সরকার ভয় পেয়ে তাকে চিকিৎসার জন্য ইউরোপ যাওয়ার অনুমতি দিয়ে দিল। আমি তাকে এ প্রস্তাব গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করে চিঠি লিখলাম। সে জানালে যে ইতিমধ্যেই সে ইউরোপ যাবে ঠিক করেছে। আমার কাছে কয়েকটা চিঠি চাইল সে ইউরোপের জন্য পরিচয়-পত্র হিসাবে। সে বলল প্রথমবারের ইউরোপ ভ্রমণে তার বিশেষ কোন লাভ হয় নি, এবার সেটা পূরণ করে আসবে। যখন তার সাতাশ আটাশ বছর বয়স, তখন সে আমাদের চুপি চুপি বলত,—ইউরোপের অন্তরটাকে নাকি আমরা বেশী বুঝি, তাই সে আমাকে আর রুদ্রকে (সুধীর) ঈর্ষা করে। আমরা ঠাট্টা করে হাসতে হাসতে বলতাম ইউরোপের তরুণীদের দেখলেই লজ্জায় লাল হয়ে ওঠাটাকে সে যদি বন্ধ করতে পারে, তবে আমাদের মত সেও ইউরোপের অন্তরটাকে বুঝতে পারবে। হয়ত আমাদের কথাটা এতদিনে তার মনে লেগেছে—তার চিঠিতে সে মহিলাদের কাছে যাবার জন্যও পরিচয় পত্র চেয়েছিল। আমি খুশী হয়েছিলাম তার এই পরিবর্ত্তনে। তাকে কয়েকটা চিঠি আমি দিয়েছিলাম; তার মধ্যে একটা ছিল আমার এক প্রিয় গায়িকা বান্ধবীর কাছে, জাতিতে এই বান্ধবীটি ছিলেন হাঙ্গেরীয়, বিয়ে করেছিলেন এক অষ্ট্রীয় লেখককে (রেনে ফুলপ মুলার)। ১৯২২ ও ১৯২৭ সালে আমি যখন ভিয়েনায় যাই, দুবারই এঁদের বাসাতে ছিলাম।

(মহিলাটি ১৯৩৭ সালে ভারতবর্ষে এসেছিলেন, আমাদের আশ্রমেই অতিথি

হয়ে ছিলেন কিছু দিন। তাঁর গান শুনে মুগ্ধ হয়ে আমার বন্ধু চাড্‌উইক একটা চমৎকার কবিতাই লিখে ফেলেছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ ২৪শে ফেব্রুয়ারীর এক চিঠিতে লিখেছিলেন—'তুমি ওর যা বর্ণনা দিয়েছ সত্যই ও তাই, আমি ভেবেছি শ্রীমতী মূলারের নাম 'নীলিমা' দিলেই ভাল হয়, তার আদর্শের সঙ্গে ঠিক মানাবে।)

ছাব্বিশ

কয়েকমাস পরে সুভাষ জানাল শ্রীমতী মূলার তার অসুখের সময় একেবারে দেবদূতীর মত শুশ্রূষা করেছে! শ্রীমতী মূলারও সুভাষের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে লিখলেন ওর মধ্যে আশ্চর্য্য অদ্ভুত কতকগুলি গুণের সমাবেশ তিনি দেখতে পেয়েছেন; ওর মহত্ত্ব ও আত্মার বিশালতা তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। শ্রীমতী মূলার লিখেছিলেন ওর মত কয়েকজন মহাপ্রাণ রাষ্ট্রনেতা যদি ইউরোপ ভ্রমণ করেন তা হলে ভারতবর্ষের জন্য অন্য কোন প্রচারের আর প্রয়োজন হবে না। আমার যতদূর মনে পড়ে সেই বছরই সুভাষ ও উদয়-শঙ্করের জন্য তিনি বিরাট সম্বর্দ্ধনা সভার আয়োজন করেছিলেন। শ্রীমতী মূলার এদের দুজনেরই ফটো পাঠিয়েছিলেন আমার কাছে। কিন্তু সুভাষের সঙ্গেই তাঁর অন্তরঙ্গতা হয়েছিল বেশী। দশ বৎসরের দুঃখময় জীবনের অভিজ্ঞতার ফলে সুভাষের যে মানসিক পরিবর্ত্তন ঘটেছিল, সেইটা বোঝাবার জন্যই আমি এতক্ষণ এই কথাগুলি লিখছি। সে বুঝতে পেরেছিল যে "নারীর" মধ্যে যা ভাল আছে তাকে বিশুদ্ধ গোঁড়া মন নিয়ে একেবারে বাদ দিয়ে চলতে গেলে 'মানুষের' মধ্যে যা ভাল আছে সেটারও অনেকটা অংশ বাদ পড়ে যায়। তার চরিত্রের বিবর্ত্তনের মধ্যে যদি আমার কোন অবদান থাকে তাহলে সেটা হয়ত এই দিক থেকেই, অন্ততঃ তাই বলে আমি আনন্দ পাব বেশী। কিন্তু নিজের অবদান সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা হওয়াটাই হয়ত স্বাভাবিক, অহংকারের চশমায় আমাদের দ্রষ্টব্যটা আকারে বড় হয়ে ওঠে! কবি পোপ বলতেন—যখন আমরা কারো সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করি তখন নিজের প্রতি দরদের জন্যই সেটা পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে পড়ে। সুভাষকে

এই কথাটা বললেই সে হেসে উঠত। তারপর সে বলত—'চশমাটাকে যখন ঠিক পাওয়ারে আনা সম্ভব নয়, তখন আর উপায় কি বলো!'

আমি খানিকটা গম্ভীর হয়ে বলতাম—'উপায় যে একেবারে নেই তা নয়। ডাঃ জনসন বলতেন মনে নেই?—"স্কচ্ ম্যানকে যদি ছোটবেলায় ধরতে পার তাহলে তাকে দিয়ে অনেক কিছুই করা যায়। মুস্কিলটা হলো, অনেক দেরী হয়ে যায় গলদ ঠিক ধরতে ধরতে, আর ঠিক করতে করতে।"

"আবার সুরু হল, দিলীপ একেবারে জন্মবোকার মত সরলতা নিয়ে জট্ ছাড়াতে চাও তুমি। মায়াবাদী যারা, তারা জন্ম থেকেই মায়াবাদী তাদের ও চশমা যতই চেষ্টা কর না কেন, তার 'পাওয়ার' বদলানো যাবে না। বিবেকানন্দর কথা ধরো, তিনি ত মোটেই বিনয়ী ছিলেন না।'

এইবার সে আমাকে সত্যই নিরস্ত্র করে ফেলল। সে সময় আমি স্বামীজীর দৃঢ়তা আর আত্মপ্রত্যয়ের সবটুকু বুঝতে পারতাম না। কয়েক-বছর পরে অবশ্য শ্রীঅরবিন্দ স্বামীজীর এই আপাতঃঅহমিকার রহস্য আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন—কেন তিনি তাঁর সহকর্মীদের চেয়ে নিজেকে অনেক বেশী বড় মনে করতেন। তিনি লিখেছিলেন : চেতনারাজ্যে চোখের সাম্নে যখন বিস্তীর্ণ প্রান্তর উন্মুক্ত হয়ে যায়, তখন এই অহমিকার ভাবকে কাটিয়ে ওঠা দুষ্কর—যদি না আগে থেকেই ঋষিত্ব ও নম্রতার সমন্বয় ঘটে থাকে। নাগ মহাশয়ের (শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য) মত ব্যক্তিদের আধ্যাত্মিক জ্ঞান আরো নম্র ও বিনয়ী করে তোলে, আর বিবেকানন্দের মত ব্যক্তিদের করে আত্মবিশ্বাসী, ও আত্মগৌরবী—ইউরোপীয় সমালোচকরা অত্যন্ত অখণ্ড তীব্র সমালোচনাই করেছেন এ নিয়ে—আবার কাউকে আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা মানুষের কাছে অহংকারী অথচ ঈশ্বরের কাছে অত্যন্ত নম্র করে তোলে।" শ্রীঅরবিন্দ বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে বিবেকানন্দের ক্ষেত্রে এটা ঠিক অহমিকাপ্রসূত নয়, এটা তাঁর আদর্শের প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় থেকে উদ্ভূত।

কিন্তু সে সময় অধ্যাত্মবাদের জটিলতা আমার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। তাই সুভাষের কথায় আমি বেশ দমে গেলাম। আত্মরক্ষার জন্য আমি তখন

বিষয়টাকে এড়িয়ে যেতে চাইলাম, বললাম, বিবেকানন্দ একটা ব্যতিক্রম, এরকম বিরাট্ পুরুষদের কথা বাদ দিয়ে আমাদের মত মানুষের পক্ষে চশমাটাকে মেজে ঘষে নেওয়াই উচিত।

যাই হোক একের পর একটি ক'রে ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে সুভাষ এই শিক্ষাটাই পাচ্ছিল। তার চিঠিগুলির মধ্যে এটা আমি বেশ অনুভব করতে পারতাম। ভিয়েনা থেকে নীলিমাও তাঁর এই রোগীটির সম্বন্ধে এই ধরণের টুক্‌রো টুক্‌রো উদাহরণ লিখে পাঠাতেন। আমি সত্যই আনন্দ পেতাম নীলিমার এই চিঠির খবরে। শ্রীঅরবিন্দকে একথা জানিয়ে তাঁকে অনুরোধ করতাম তার আধ্যাত্মিক পরিবর্ত্তনের জন্য আরো চেষ্টা করার জন্য। মাঝে মাঝে আমার সন্দেহ হতো নীলিমার খবর সবটা সত্য হওয়া সম্ভব নয়—এ যে খুব বেশী ভাল, একি চিরস্থায়ী হবে ?

কিন্তু তাই বলে হতাশ হতাম না আমি। নীলিমা লিখ্‌তেন, সুভাষ শুধু বিনয়ীই নয়, সে শিশুর মত সরল। "আপনি যখন শ্রীঅরবিন্দের আশীর্ব্বাদী ফুল পাঠিয়েছিলেন, কী খুশীই যে তিনি হয়েছিলেন, তা যদি দেখতেন !"

এই ধরণের খবরে আমি উৎসাহিত হয়ে উঠতাম। আস্তে আস্তে আমার চিন্তাধারা তার কাছে আরো বেশী করে খুলে ধরতে লাগলাম। শেষে একদিন ধারণা করে বসলাম—সে আমাদের পথেরই যাত্রী হবে। ধারণাটা একটু বেশী তাড়াতাড়ি হয়ে পড়েছিল, তার ফল হল অত্যন্ত সাংঘাতিক। তার মনোভাব না বুঝে নিজের ধারণার প্রতি অত্যন্ত বেশী আস্থাবান হ'য়ে অতর্কিতে তাকে ঘা দিয়ে ফেললাম।

আবার যখন আস্তে আস্তে সে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বসল তখন জেলে বসে যেটা সে প্রায় স্বীকার করতো বসেছিল সেটাকে ভুলে গেল। অহমিকার কুয়াশায় আমরা যে স্বার্থের সৌধ গড়ে তুলি আর তাই নিয়ে গর্ব্বে মত্ত হয়ে পড়ি, আসলে তার মূল্য কতটুকুই বা ?—সুভাষ এই কথাটা তখন ভুলে গেল। হঠাৎ সে একদিন আমাকে চিঠি লিখে বসল—'নির্জ্জনবাস ছেড়ে চলে এসো এখানে, ইউরোপে বড় বড় লোকদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করে নাও। নিজেকে যদি প্রতিষ্ঠিত করতে চাও, আমার মত চলে এসো এখানে।'

হঠাৎ তার এই পরিবর্ত্তনে আমি মর্ম্মাহত হয়ে গিয়ে তাকে লিখলাম, শুধু কাজ করার জন্যই যদি কাজ করা হয়, সে কাজে আমার বিশ্বাস নেই। কোন ব্যক্তির সংস্পর্শে এসে নিজের চরিত্রকে যদি উন্নততর করতে না পারি তবে সে আলাপের কোন মূল্য নেই আমার কাছে। তাছাড়া অনেক লোকের সঙ্গেই ত আমার আলাপ হয়েছে! তাই শেষ পর্য্যন্ত আমি গুরুদেবের কাছে এসে আশ্রয় নিয়েছি। তারপর গুরুবাদ সম্বন্ধে আমার লেখা কবিতাটার শেষ কয় লাইন তাকে লিখে দিই: ("অনামী"র গুরুবাদী শীর্ষক কবিতা)

আর কি লিখেছিলাম তাকে মনে নেই। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে তাকে আকর্ষণ করার মত কিছু লিখি নি। গীতায় যে নিষ্কাম কর্ম্মের নির্দ্দেশ আছে তার সঙ্গে এই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত কর্ম্মের যে কোন মিল নেই সেই কথাটা সুভাষকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলাম আমি—তার কর্ম্মের পিছনে যখন একটা স্বার্থ বা উদ্দেশ্য রয়েছে, তখন তা নিষ্কাম কর্ম্ম ত নয়।

আমার মনে হয় সুভাষ আমাকে এর ফলে ভুল বুঝেছিল। এর উত্তরে সে আমাকে তীব্র আবেগভরা এক চিঠি লিখেছিল তার মতকে সমর্থন করে। চিঠিতে সে আমাকে আঘাত করেছিল। জীবনে এই একবার সে আমাকে আঘাত দিয়েছিল। চিঠিটা আমি হারিয়ে ফেলেছি—কিন্তু তার কথাগুলো আমার মনে আছে স্পষ্টাক্ষরে। সে যা লিখেছিল মোটামুটি তার অর্থ হলো 'দিলীপকুমার আর অনিলবরণের মত ছেলেরা যখন বিচারবুদ্ধি ছেড়ে অন্ধ বিশ্বাসের পিছনে ছোটে' তখন সে দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশ হয়ে পড়ে। ঈশ্বরের গুণ মানুষের ওপরে কেমন করে আরোপ করে লোকে এতে আশ্চর্য্য বোধ করেছিল সে। অন্ধ বিশ্বাসের ফলে মানুষ এমন একটা মতবাদের সৃষ্টি করে যার সঙ্গে অন্য কারো মতই মেলে না। শুধু বিচারবুদ্ধির ফলে মানুষের চিন্তাধারার মধ্যে সামঞ্জস্য আসতে পারে। ভারতবর্ষের সাধারণ লোক সব কিছুতেই বিশ্বাস করে, তাই 'ভগবানের অবতারেরা' এখানে নির্ব্বিবাদে তাদের কাঁধে চড়ে যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করতে পেরেছেন। আমাদের মত বিংশ শতাব্দীর ছেলেরা যারা জ্ঞানের আলোক পেয়েছে তারাও কী করে এই 'ভক্তদের দল ভারী করে?" এমনি ধরণের অনেক তীব্র মন্তব্য সে

করেছিল। এর আগে একটা চিঠিতে সে লিখেছিল—'যোগ জীবনকে বাদ দিয়ে নয়' শ্রীঅরবিন্দের এই বাণীর সঙ্গে তোমাদের নির্জ্জন জীবনযাত্রার মিল কোথায়?…তার এই দৃষ্টিভঙ্গী হয়ত খানিকটা ইউরোপের কর্ম্মবাদ থেকেই গড়ে উঠেছিল।

তার অভিযোগগুলির জবাব দিয়েছিলেন শ্রীঅরবিন্দ—তাঁর চিঠিটা আমি তুলে দিচ্ছি।—

"দিলীপ, তোমার হতাশ বন্ধুটি চান সবাই তাঁর মত ও পথ অনুসরণ করে চলুক। কেন তা হবে? রাজনীতিকের এই স্বপ্ন কখনই ত সার্থক হয় না। আর যদি হয়-ও তবে মানুষের মন ও জীবনকে বন্দী করেই সেটা সম্ভব হয়। কর্ম্মবাদী মানুষের এইটাই শেষ প্রয়াস। 'ভগবানের অবতার', গুরুদের সম্বন্ধে তাঁর তীব্র অভিযোগ। কিন্তু তাদের আশা ত খুবই সামান্য—শুধু কয়েকজন শিষ্য—বড়জোর একটা আশ্রম। আর এও ত তারা চায় না নিজে থেকে। শিষ্যেরাই আসে তাদের কাছে। এই নগণ্য অবতার'রাই কি রাজনৈতিক নেতাদের চেয়ে বেশী যুক্তিবাদী নয়? অবশ্য কেউ কেউ একটা পৃথিবীব্যাপী ধর্ম্মপ্রচারের আশা রাখেন, কিন্তু আমরা ত তা চাই না। তাছাড়াও তিনি তোমাকে তিরস্কার করেছেন অন্ধবিশ্বাসের কাছে যুক্তি-বিচারকে জলাঞ্জলি দিয়েছ বলে। কিন্তু যুক্তিসহ বিশ্বাস ছাড়া তাঁর মতবাদই বা কী? তোমার বিশ্বাস অনুযায়ী তুমি চল, তাঁর বিশ্বাসমত তিনি চলেন এ ত স্বাভাবিকই, কিন্তু তাঁর মত যে তোমার মতের চেয়ে তাড়াতাড়ি সত্যে পৌছাতে পারবে তার কোন সম্ভাবনা নেই। তাঁর যুক্তি অনুযায়ী 'তাঁর' মত নির্দ্ধারিত হয়, তাঁর বিরোধীদের মতও ত 'তাঁদের' যুক্তি এবং বিশ্বাস অনুযায়ীই নির্দ্ধারিত হয়েছে। কিন্তু তাঁদের মত উভয়েই সম্পূর্ণ ভিন্ন। কোন্ যুক্তি, কোন্ বিচার ব'লে দেবে কোনটা সত্য, আর কোনটা মিথ্যা? বিরোধী দুই পক্ষ যদি আলোচনা করতে বসে তাহলে তর্ক করে করে মুখচোখ লাল হয়ে উঠলেও কোন মীমাংসা হয় না আলোচ্য বিষয়ের। কোন সিদ্ধান্তই সম্ভবপর হয় না। শেষ পর্য্যন্ত সেই জেতে যার জোর বেশী, অথবা ঘটনাবলী যার পক্ষে অনুকূল। কিন্তু কেউ কি বলতে

পারে পৃথিবীতে যা হচ্ছে বা যা ঘটছে সেগুলি সবই যুক্তি দিয়ে সমর্থন করা যায়? প্রকৃতপক্ষে এমন কোন অভ্রান্ত যুক্তি নেই যা দুটো বিরোধী মতের সঠিক বিচার করে কোনটা ঠিক আর কোনটা নয় তা বলে দিতে পারে। তোমার যুক্তি, আমার মত, তার বিচারবুদ্ধি—ওর ধারণা—এই নিয়ে শেষ পর্য্যন্ত পরস্পরবিরোধী কতকগুলি তর্কের সৃষ্টি হয়। প্রত্যেকেই বিচার করে তার ধারণা, তার মত অনুযায়ী অর্থাৎ তার মানসিক পরিবেশ ও পছন্দ-অপছন্দের মাপকাঠি দিয়ে। সুতরাং রহস্যময় এই পৃথিবীর আপাত-বিরোধের মাঝখানে বিশ্বাসটাকে উড়িয়ে দেবার কোন কারণ নেই। বরং সেইটাই এই বিরোধের একমাত্র সমস্যা নয় কি? যদি কেউ সত্যই প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী হতে পারেন তবে সে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু যদি অজ্ঞানতাবশতঃ তর্কই করে যেতে হয় তবে সেক্ষেত্রে বিশ্বাসের মূল্যটাই বেশী। বরং বিশ্বাসটাই হয়ত সেই প্রকৃত জ্ঞানের একটা আলোকরশ্মিও ত হতে পারে। আর তাছাড়া বিশ্বাসের বলেই ত শেষ পর্য্যন্ত কোন একটা কাজ সম্পন্ন করা যেতে পারে। এটাই একটা যুক্তি, নয় কি? অন্য সব যুক্তিতর্কের মত বিশ্বাসপ্রবণ কারো কাছে এটাই ত বিশ্বাস এনে দেবার পক্ষে যথেষ্ট; অথচ যে অবিশ্বাসী তার কাছে কিছুতেই এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়! তারা আসলে যুক্তির ভিত্তি যার ওপর সেটাকেই মানতে চায় না। যুক্তিতর্ক আসলে মনের একটা সংযত লীলাছন্দ মাত্র, তার চেয়ে বেশি কিছু নয়।

"তোমার আসল কথাটাই অবশ্য সঠিক উত্তর: কর্ম্মের উপর এতখানি জোর দেওয়ার কোন অর্থই হয় না, যদি যার জোরে কাজ করব সেই জিনিষটাই না থাকে। 'জীবনকে বাদ দিয়ে যোগ নয়' এর অর্থ এ নয় যে জীবনকে যেমন দেখছি, যেমন বর্ত্তমান রয়েছে তার সহস্র অজ্ঞতা দৈন্য, আর আবেগ ও সংজ্ঞা ও বিচারের সংঘাত দিয়ে তেমনি জীবনকে মেনে নিতে হবে! যাঁরা কর্ম্মবাদী তাঁরা মনে করেন মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি ও উগ্র উৎসাহ দিয়ে সব কিছুই বুঝি ঠিক করে দেওয়া যায়। উন্নততর বুদ্ধিবৃত্তি ও উৎসাহের অদম্য অপচয়ের পরও যে পৃথিবীর

অবস্থা আজ পর্য্যন্ত এমন রয়ে গিয়েছে সেইটাই ত তাদের মতকে ভুল প্রমাণ ক'রে দেয়। যোগবাদী বলে যে কেবল চেতনার পরিবর্ত্তনের ফলেই জীবনের প্রকৃত ভিত্তিটাকে জানা যেতে পারে। অন্তর থেকে বাহির, উৎস থেকে পরিবেশ এইটাই আসল পন্থা। কিন্তু অন্তর মানে শুধু উপরকার আধ ইঞ্চি মাত্র নীচে নয়। আত্মাকে, নিজেকে আর ঈশ্বরের সত্তাকে জানতে হলে আরো গভীরে অনেক গভীরে যেতে হবে, কেবল তখনই আমাদের বর্ত্তমান জীবনের অসম্পূর্ণের ধোঁয়াটে আর অসমঞ্জস এই সত্তাকে ছাড়িয়ে আমরা কি হতে পারি, সেই ভবিষ্যতের বহিঃপ্রকাশ হবে আমাদের জীবন। প্রশ্নটা হল: আমরা কী এই চিরাচরিত প্রথায় অজ্ঞানের মধ্যে পথ হাতড়ে বেড়াব হঠাৎ একটা কিছু আবিষ্কার করে ফেলার একটা দুরাশা নিয়ে; না, অন্তরের আলোকের আশায় প্রতীক্ষা করে যতক্ষণ না আমরা ঈশ্বরের সন্ধান পাই এবং তাঁর প্রসাদে নিজের অন্তরে এবং বাহিরে তাঁর প্রতিষ্ঠা করতে পারি?"

এর কিছু পরেই সে ফিরে এলো, তার স্বপ্ন সাধনার দেশে—তার 'অমর জন্মভূমিতে'। তখন ১৯৩৬ সালের এপ্রিল। সে নিশ্চিতভাবেই জানত যে সে আবার গ্রেপ্তার হবে। কিন্তু দুধের ছেলের মতই সে মাকে ছেড়ে থাকতে পারত না—এ মা তার অমর জন্মভূমি। এইখানেই তার সঙ্গে জহরলালের বিরাট পার্থক্য ছিল। তাছাড়া জেলের ভয়ে দূরে সরে থাকা তার আত্মসম্মানে বাধত।

বোম্বাই-এ পৌছানর সঙ্গে সঙ্গেই সে গ্রেপ্তার হল ঠিকই। আমি উদ্বিগ্ন হয়ে তাকে চিঠি লিখলাম, কিন্তু এবার আর তার কাছ থেকে কোনো উত্তর এল না। আমি অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। তবে কি আমি তার মনে আঘাত দিয়েছি? আমার কি ক্ষমা চাওয়া উচিত ছিল? আমি কি জেলে তার সঙ্গে দেখা করব? ভেবে কিছুই ঠিক করতে পারলাম না।

১৯৩৭এর প্রথম দিকে একটা কথা শোনা গেল, সুভাষকে নাকি বিনাসর্ত্তে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। আমি গুরুদেবের অনুমতি চাইলাম কলকাতা চলে আসার জন্য। আট বছর ত সব ছেড়ে আশ্রমে রয়েছি এবার একটু বাইরে

যাওয়া আমার উচিত নয় কি? তাছাড়া ওর জন্য আমি খুব ব্যাকুল হয়ে উঠেছি, এইসব বলে গুরুদেবকে বোঝালাম। গুরুদেব বোধ হয় অন্তরে অন্তরে হেসেছিলেন আমার কথায়। যাই হোক তাঁর অনুমতি পেলাম। কলকাতা এসে পৌঁছবার কয়দিন বাদেই এলগিন রোড থেকে ফোনে খবর পেলাম সেইমাত্র সুভাষ ছাড়া পেয়েছে; আমাকে তখুনি যেতে হবে। বলা বাহুল্য সেই মুহূর্ত্তেই রওনা হয়ে পড়লাম। বাইরের ঘরে আমি সবে ঢুকছি সে বেরিয়ে এল। এ কি চেহারা হয়েছে তার! কিন্তু সে যেন অধ্যাত্মবাদী হয়ে উঠেছে মনে হল। সে আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলল শিশুর মত। আমিও খুব বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম, তার চেয়েও আশ্চর্য্যই হয়েছিলাম বেশী। সুভাষ আত্মসংযম হারিয়ে ফেলে কাঁদছে! আমি ভাবলাম আমাকে সেই রূঢ় চিঠিটা লিখে ফেলেছিল বলেই বুঝি সে অশ্রু দিয়ে ধুয়ে নিতে চায় সব মালিন্যকে।

কিন্তু কথা বলতে বলতে আমি লক্ষ্য করলাম তার গভীর একটা পরিবর্ত্তন হয়েছে। দীর্ঘ দিনের অশ্রান্ত সংগ্রাম, ব্যর্থতা আর কারাবাসের ফলে এই তরুণ তাপসের রূঢ় বহির্বাসটা জীর্ণ হয়ে পড়েছে। সত্যই সে ছিল তাপস, যদিও তার তপস্যা নির্জন তপোবনে নয়। পৃথিবীর উপর বিরক্ত হয়ে বানপ্রস্থ অবলম্বন সে করেনি। সে মায়াবাদীও ছিল না, সে মায়াবাদীদের আন্তরিকতায় অবিশ্বাসও করত না, কিন্তু তাদের মতে সে আস্থা স্থাপন করতেও পারত না। কিন্তু এ সত্ত্বেও সে ছিল যোগীপুরুষ, সে ছিল তাপস। গৃহী সে কোন কালেই ছিল না—গৃহের প্রতি বীতরাগ তার ছোটবেলা থেকেই। তাছাড়া মনে হত তাকে দেখেই যেন এই সুফী কবিতাটি লেখা হয়েছিল।

"যারা হুযুল ইশকাকি না কামিয়োঁ মে হ্যায়
যো উমর্ রাইগন হ্যায় উহ্ হি রাইগন নহি"
তোমার পিছে ছুটনু মিছে
জীবন আমার কাটল বাজে
শূন্য কলস রইল খালি

এখন দেখি শূন্য তো নয়
সেই খোঁজাতে সফল জীবন
ভরল সোনায় আমার ডালি।

তার স্বপ্নাতুর অথচ দীপ্তিময় চোখদুটোর দিকে চেয়ে আমার গভীর আনন্দ হল। তাহলে আমার ধারণা ত ভুল হয় নি। তাকে ঠিকই বুঝেছিলাম। আসলে সেই মরমী ঈশ্বরই তার ধ্যানের বস্তু, শুধু তখনকার মত তার স্বপ্নসিংহাসনে ঈশ্বরের জায়গায় সে বসিয়েছে তার মাতৃভূমিকে। আমি ঠিক হয়ত এটা বোঝাতে পারব না: সত্যই যেটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সেটাকে ত প্রমাণ করা যায় না।

আমি এটা প্রমাণ করতে চাই-ও নি কোনকালে। আমার প্রিয়তম বন্ধু, যে আমার কৈশোরে ও যৌবনের প্রারম্ভে ছিল আমার আদর্শ স্বরূপ, আজ তার জীবনস্মৃতি লিখতে বসেছি, তার প্রতি আমার যে অসীম ঋণ রয়ে গেছে, তাই পরিশোধ করার জন্য। তাকে মরমী ভাববাদী বলেই আমার মনে হয়েছে, আমার এই জীবনস্মৃতিতে সুভাষকে সেই ভাবেই দেখাবার চেষ্টা করেছি। সুভাষ যদি মরমী না হত তাহলে হয়ত আমার এই ঋণ পরিশোধকে এত পবিত্র কর্ত্তব্য বলে মনে করতাম না। এতে যা দেখাবার চেষ্টা করেছি তা যদি ঠিক না-ও ফোটে কোন খেদ নেই; 'কর্ম্মণ্যে-বাধিকারস্তে মা ফলেষু --'।

সেদিন সকালে সে বেশী কথা বলে নি! সাধারণত সে কথা কমই বলত, বিশেষ করে বাইরের লোকের সম্মুখে। সেদিন তখন বাইরের কোন কোন বন্ধুও ছিল। তাহলেও ওরই মধ্যে সে মাঝে মাঝে দু একটা কথায় বলতে লাগল, কী ভাবে তার দিন কেটেছে। হাসতে হাসতে সে বলল, পাপ তার গজাক আর নাই গজাক, বুদ্ধি যে একটু বেড়েছে তাতে সন্দেহ নেই। কথাটা সত্য। তার চোখে দুঃখের ছায়াপাত হয়েছে বটে কিন্তু তার মধ্যে যে দীপ্তি দেখলাম, তা এতদিনের কর্ম্মচঞ্চল ব্যস্ততার মধ্যে কোন দিন দেখেছি ব'লে মনে পড়ে না।

সাতাশ

কয়েক সপ্তাহ বাদে সে একদিন সন্ধ্যাবেলায় আমাকে নিমন্ত্রণ করল। আমি উৎসুক হয়ে ছিলাম তাকে একটু একা পাবার জন্য। কিন্তু যখনই তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছি বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজন আর ভক্ত শিষ্যদের ভীড়ে হারিয়ে ফেলেছি তাকে। তাই বোধহয় সে একটা সন্ধ্যা শুধু আমার জন্য আলাদা করে রেখেছিল। চোখের মধ্যে সেই বিষণ্নতার ছায়াটা যেন প্রায় মিলিয়ে গিয়েছে, কিন্তু তবু তাকে ক্লান্তই দেখাচ্ছিল। সে যেন গভীর একটা কিছু ভাবছিল।

আমি শুধালাম শরীর কি খারাপ হয়েছে তার। নিজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সে সব সময় উদাসীন,—হেসেই উড়িয়ে দিল কথাটা। এইভাবে দুঃখকষ্ট সহ্য করাই তার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। আমি এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সে হেসে বলল, 'দোহাই তোমার, মনে হচ্ছে এবার তুমি 'শহীদ' বানিয়ে ছাড়বে আমাকে।' একথাটার একটা পূর্ব্বাভাস হয়েছিল, বলছি সে কথা। মান্দালয় থেকে ১৯২৫ সালের ২রা মে সে একটা চিঠি লিখেছিল আমাকে।

"আমার এই জেলযাত্রাকে তুমি বলো শহীদের দুঃখবরণ। এটা আমার প্রতি সহানুভূতি আর তোমার হৃদয়ের মহত্ত্বেরই পরিচয় দেয়। কিন্তু আমার ত মাত্রাজ্ঞান আছে। আমি নিজেকে শহীদের উপাধি দিতে পারি না। ঔদ্ধত্য আর অহমিকার হাত থেকে আমি নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে চাই।"

তার সে কথা আমার খুব মনে লেগেছিল, কারণ এটা তার সামাজিক বিনয় নয়, এ তার অন্তরের কথা। বরাবরই সে অত্যন্ত আন্তরিক। শুধু ১৯১১ সালে ইংলণ্ড থেকে ফেরার পর সে যেন কিছুটা বেশী আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল। তখন যৌবনের প্রারম্ভ। আমি সর্ব্বপ্রথম সেইদিন সন্ধ্যাতেই তাকে একথা বল্লাম।

বিষণ্নভাবে সে হাসলো।

"আত্মপ্রত্যয় থাকা উচিত-ই, কিন্তু নিজের সম্বন্ধে খুব বেশীমাত্রায় প্রত্যয় থাকাটা আবার ঠিক নয়। সেটা অহমিকা।"—সে বললো।

এতক্ষণ সুযোগ খুঁজছিলাম পুরানো সেই ভুলের বোঝাটাকে ঝেড়ে ফেলার জন্য, সেই সুযোগ এবার পেয়ে গেলাম। বল্লাম—"তোমার কী মনে হয় না যে একথাটা বলা যত সহজ, কাজে করা তত সহজ নয়।"

"কী বলতে চাইছ, খুলে বলো ত ?"

"তুমি ত বুঝতেই পারছ।"

"তা হোক, তবু তুমি বলো।"

"দেখো, কথাটা—নাঃ, খোলাখুলি বলাই ভালো। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে চাচ্ছিলাম যে, নিজের সম্বন্ধে বেশী আত্মপ্রত্যয় থাকা উচিত এ যদি তুমি মানো, তাহলে গুরুবাদ সম্বন্ধে তুমি আমাকে ভুল বুঝলে কেন? আমি বলতে চাই যে নিজেদের বিচারবুদ্ধিতে অনেক ভুল হওয়া স্বাভাবিক বলেই গুরুর প্রয়োজন! এটা কি তুমি বুঝতে পার নি ?"

"বুঝতে পেরেছিলাম ঠিকই। কিন্তু তোমাকে ঠিক উল্টো দিকটা সম্বন্ধে সাবধান করে দিতে চেয়েছিলাম। তুমি ত জানো গুরুবাদকে আমি অশ্রদ্ধা করিনা—নিজেও ত আমি রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের ভক্ত। কিন্তু অন্ধ গুরুবাদের যে বিপদ আছে সে সম্বন্ধেও সাবধান থাকা দরকার। সাধারণ লোকে কী ভাবে গুরুবাদকে মেনে নেয়, এবং কেন নেয় তা কি তুমি জানো না ?—তারা ভাবে তার কল্যাণের জন্যে গুরুদেব জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্য্যন্ত সবই করে দেবেন। দৈবের কাছে প্রার্থনা জানাতে জানাতে পুরুষকার মরেই গিয়েছে আমাদের দেশে। আর গুরুবাদ কী? আমাদের ক্লৈব্যের মূল কারণ এই গুরুবাদ, গুরুবাদ আমাদের কর্ম্মপ্রেরণাকে নষ্ট করে দিয়েছে।"

"এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে কোন মতদ্বৈধ থাকতে পারে না, কিন্তু তুমি জাতির কথা না বলে যদি ব্যক্তির কথা বলতে তাহলে বেশী খুশী হতাম। মহাভারতে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন, যেমন উর্ব্বরা জমি ভিন্ন বীজ অঙ্কুরিত হয় না তেমনি পুরুষকারের সাহায্য ছাড়া দৈবও নিষ্ফল হয়ে যায়। সেইজন্যই যাঁরা জ্ঞানী তাঁরা দৈব ও পুরুষকারের মিলন চান কারণ দুটো পরস্পরকে পূর্ণাঙ্গ করে। সেদিন মহাভারত পড়তে পড়তে এই উপমাটা আমার খুব ভাল লেগেছিল। আমি তোমাকে তিরস্কার করার জন্য মহাভারতের কথা

তুলছি না, সুভাষ; তোমার মতের সঙ্গে এটা মিলে যায় বলেই বলছি। আমাদের প্রাচীন ঋষিরা কখনই গুরুবাদের নামে ক্লৈব্যকে প্রশ্রয় দিতে চাননি। কোন আসল গুরুই তাঁর শিষ্যকে নির্জীব নিরুৎসাহী ক্লীবে পরিণত করতে চান না। আমার সম্বন্ধে তোমার এইটুকু বিশ্বাস থাকা উচিত যে আমি অন্ধ ক্রীত-দাসের মত কোন গুরুর পদসেবী হয়ে পড়ব না। তাছাড়া আমি জানি তুমি জহরলালের মত নও। জহরলাল অধরা রহস্যের অভিজ্ঞতার মধ্যে যেতে চান না, তিনি শুধু বিধেয়টাকে দেখেন, তুমি ত আসলে অধ্যাত্মবাদী। তুমি জানো যে ওপরটা দেখে কখনই অন্তর্নিহিত সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। কিন্তু তুমি এখন যা বলছ তা যেন শ্রদ্ধেয় জহরলালের কথাই—ধর্ম্ম ভারতবর্ষের অবনতির মূল কারণ।”

সে বুঝতে পারলো আমার কথাটা। খানিকটা উত্তেজিত হয়ে বললো, “তাঁর কথা থাক। তাঁর সঙ্গে আমার আদর্শগত কোন মিলই নেই।”

“সেইজন্যই ত তাঁর মত গুরুবাদের অনিষ্টকারিতা সম্বন্ধে তোমার এরকম সাধারণভাবে তীব্র মন্তব্য করা উচিত নয়। কারণ তাহলে আগেই যেন ধরে নেওয়া হচ্ছে সব গুরুই খারাপ। আমার কথা হল ভণ্ড গুরু নিশ্চয়ই অনিষ্ট করে, কিন্তু সবাই ত ভণ্ড নন। আমার মনে আছে তুমিই একবার মান্দালয় থেকে লিখেছিলে, শ্রীঅরবিন্দ বিবেকানন্দের চেয়েও আরো গভীর জ্ঞানী। তোমার কী করে তবে মনে হল যে তিনি স্বার্থান্বেষী ভক্তদের শিষ্য বলে গ্রহণ করেন? তুমি কি তাঁর “মা” পড়নি?”

‘তোমার আত্মসমর্পণ স্বেচ্ছাকৃত নিঃস্বার্থ হওয়া চাই…তোমার আত্মসমর্পণ হবে প্রাণবান্ মানুষের—জড়পদার্থের মত নয়।’

সুভাষ তর্জ্জনী তুলে যেন আমাকে সাবধান করল। একটু ম্লান হেসে বলল—

“দেখো দিলীপ, তুমি আবার ভুল করছ, তুমি ধরেই নিচ্ছ আমি যেন শ্রীঅর-বিন্দের প্রতি কোনো কটাক্ষ করেছি।”

“কিন্তু সুভাষ, তুমি কি তাহলে একজন শিল্পী পূজারীর প্রতিই কটাক্ষ করেছ বলতে চাও? তাহলে তোমার মন্তব্যের এত তীব্রতা এলো কোথা থেকে।”

সে আমার হাতটা ধরে বলল, “দিলীপ আমি কোন অবস্থায় কী লিখে

ফেলেছি তা নিয়ে তুমি কিছু মনে ক'রো না ভাই।" বলতে বলতে তার গলা ভারী হয়ে উঠল।

"তুমি ত মনস্তত্ত্বও বোঝ, উত্তেজনার মুহূর্তে আমরা যা কিছু বলে ফেলি, তা সবটাই হয়ত আমরা বলতে চাই না, নিজেরা হয়ত বিশ্বাসও করি না। আমাদের দিয়ে দুষ্টা সরস্বতী অনেক সময় এমন কথা বলিয়ে নেন যা ঠিক আমার অন্তরের কথা ত নয়ই, বরং তার বিপরীত।" তার এই কথার মধ্যেই সহিষ্ণুতা ও আত্ম-সমালোচনার সুরটা সেদিন সন্ধ্যায় আমাদের সব কথার মধ্যেই প্রভাব বিস্তার করেছিল। যোগ অভ্যাসের মধ্য দিয়ে আমার কী কী অভিজ্ঞতা হয়েছে,—আমার ব্যর্থতা ও সফলতা সবই তাকে বলেছিলাম সেদিন; সে সব কথা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে। একটা কথা বললেই বোধ হয় যথেষ্ট হবে যে আমি তাকে বলতে চেয়েছিলাম আত্মনিবেদনের মধ্য দিয়েই শুধু সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

সে বলল: আমার বন্দীজীবনে অনেক কিছুই আমি শিখেছি, দিলীপ। নিজেকেও খানিকটা চিনতে পেরেছি। তুমিও অনেকদিন নির্জ্জনবাস করেছ, তুমি বুঝতে পারবে—বাহিরের জগৎটা যখন রুদ্ধ হয়ে যায়, অন্তরের জগৎ তখন উন্মুক্ত হয়ে ওঠে মানসচক্ষে। এর কাছে আমাকে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে। তাই থেকেই আমার আত্মনিবেদন ও সহিষ্ণুতা শিক্ষা হয়েছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য্য যা আমার কাছে আগে অনিষ্টকর মনে হতো, তাই আমাকে সাহায্য করেছে সব চেয়ে বেশী। এর ফলে আমি একটা আলোকের সন্ধান পেয়েছি; সে আলোক চিনিয়ে দিয়েছে আমার আত্মার স্বরূপকে। আমি নিজে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছি নতুন রূপে। তুমি আত্মসমর্পণের কথা বলেছ, অতদূর আমি পারি নি। ওকথাটা আমার মনেই জাগে নি। আমি শুধু সংগ্রাম করেছি আমার বিদ্রোহী ভাবটার সঙ্গে। মনে হয়েছে এই অসহিষ্ণুতা ও বিদ্রোহী ভাব আমার স্বাস্থ্যটাকে কুরে কুরে খেয়ে ফেলছে, আমার সর্ব্বনাশ করছে। কিন্তু আমি পারি নি। আমি অস্থির হয়ে উঠেছি, অস্বস্তি অনুভব করছি।

"আমি বুঝতে পেরেছি আমার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ছে। কিন্তু কি করব?

আমার ত গুরু নেই। আমি নিজেকে তখন নিরীক্ষণ করতে সুরু করেছি। সে অত্যন্ত সুদীর্ঘ ব্যক্তিগত ইতিহাস। তাছাড়া আমি যা বুঝতে পেরেছি তাও পূর্ণাবয়ব নয়, তাকে ঠিক বোঝানো যায় না। সে সব কথা আজ থাক। শুধু এই কথাই তোমাকে বলতে চাই যে দিনের পর দিন আমার এই সমীক্ষণের মধ্য দিয়ে অনুভব করেছি কেন আমাদের প্রাচীন ঋষিরা বলে গেছেন নম্রতা, সহিষ্ণুতা আর বদান্যতাই জীবনের শ্রেষ্ঠ পথপ্রদর্শক। এর সাহায্যেই আমি বুঝতে পেরেছি কেন কারও বিষয়ে অপরের তীক্ষ্ণ অসহিষ্ণু সমালোচনা করা উচিত নয়। আমরা সবাই ত অন্ধ, সবাই ত দুর্ব্বল। অথচ আশ্চর্য্য এই যে যখনই আমরা নিজেদের দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠি তখনই অন্তরের গভীর থেকে শক্তি অনুভব করি। তার বলে একটা পরিবর্ত্তন আসে। আমার মধ্যেও এই পরিবর্ত্তন এসেছে, আমি ন্যায়নিষ্ঠার ব্রত গ্রহণ করেছি। আমি সংকল্প নিয়েছি আমার প্রতিটি কর্ম্ম ও চিন্তাধারাকে অনুধাবন করবো এবং ঠিক অপরের বেলায় যেমন করি তেমনি তার নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ করবো। এর ফলে সহিষ্ণুতা এসেছে—অবশ্য কার্য্যতঃ সব সময় সেটা থাকবে কিনা জানিনা—তবু আমি অনুভব করেছি ঘোরতর সংঘাতের সময়ও শত্রুর প্রতি আমাদের খুব বেশী কঠোর হলে চলবে না বরং তাদের একপক্ষে ভালবাসতেই হবে।”

তারপর নিজেকে যেন একটু বিদ্রূপ করেই বলল—“আমার মনে মনে তাই রয়েছে বটে কিন্তু আমি নিজে এতদূর উদার হয়ে উঠতে পেরেছি বাস্তবক্ষেত্রে, তা আমি জোর করে বলতে পারি না। মনের ইচ্ছা আর তাকে কাজে পরিণত করা এর মধ্যে তফাৎ ত অনেকখানি। কাজটা খুবই কঠিন সন্দেহ নেই—আত্মপ্রেম আমাদের এত প্রবল যে শত্রুপ্রীতি সেখানে বেশীক্ষণ স্থান পায় না। কখনো কখনো শত্রুপ্রীতির উদারতা যে থাকে না নয়; তা যদি না থাকতো তবে পৃথিবীটা কোনদিন ধ্বংস হয়ে যেত। অপরের প্রতি প্রীতির উদারতা আমাদের সবারই কিছু না কিছু আছে। আত্মপ্রীতির পক্ষে পর-প্রীতি মারাত্মক—এই ভয়টা যদি

আমাদের কেটে যায় তবে আমরা বোধ হয় আরো বেশী অপরকে ভাল বাসতে পারি। আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বলতে পারি অপরকে ভালবাসতে পারাটাই দুরূহ, শত্রুকে ভালবাসা ত আরো কঠিন। ছোটবেলায় পড়েছিলাম, বুদ্ধ বলেছেন মা যেমন শিশুকে ভালবাসেন তেমনি সব প্রাণীকেই আমাদের ভালবাসতে হবে। বুদ্ধদেবের এই বাণী পড়ে কী আনন্দই আমার হয়েছিল!

"তারপর গলার স্বর তার নেমে এল, ধীরে ধীরে সে বলল—"কিন্তু আমার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার পথ থেকে দূরে সরে এসেছি, বুদ্ধদেবের সেই ভালবাসার ক্ষমতা যেন আমি হারিয়ে ফেলেছি। কিন্তু দিলীপ, তুমিও বোধ হয় লক্ষ্য করেছ যে জীবনে কোন জিনিস পেতে গেলে, তার পথ সুগম নয়। আমার কাছে কোন পথই ফুলের পাপড়ি বিছানো নয়। তুমি গুরুবাদের শরণ নিয়েছ। সত্য কথা বলতে কি এবিষয়ে তোমার পথ যে ভাল তা আমি বলতে পারব না। বরং মাঝে মাঝে সন্দেহই হয়েছে তোমার বিচারবুদ্ধিতে। কিন্তু সেদিন তোমাকে দেখার পর আমার সন্দেহ দূর হয়েছে। ফল থেকে যদি গাছের বিচার করতে হয় তাহলে বলতে হবে যে, তুমি শুধু অধরার পিছনে ঘুরে বেড়াচ্ছ না। অবশ্য জহরলালের কাছে হয়ত এটা মরীচিকা ভ্রমই।"

একমুহূর্ত্তের জন্য তার মুখে একটা বিদ্রূপের হাসি দেখা গেল। তারপর আবার গম্ভীর হয়ে বলতে লাগল: "আমি সহিষ্ণুতা আর উদারতার শিক্ষালাভ করেছি। আর তুমি কি লাভ করেছ, বলব?"

একটু হেসে বলল: "তুমি আজকে তোমার দুঃখ কষ্ট, পতন উত্থানের কাহিনী আমায় বলেছ—না—না, অন্য কারো কাছে এ বর্ণনা আমি করতে পারব না—আমার ত তোমার মত গুছিয়ে বলার, বক্তৃতা দেবার ক্ষমতা নেই—

"দেখো, সুভাষ—"

"হেসে উড়িয়ে দিচ্ছ? তা দাও"—দুজনেই আমরা হেসে উঠলাম।

খানিকক্ষণ নিস্তব্ধতার পর সে-ই আবার কথা বল্ল—"হ্যাঁ শোনো, কী

বলছিলাম আমি? হ্যাঁ, আমি তোমাকে লক্ষ্য করছিলাম, তোমার প্রত্যেকটি কথা, তোমার আবেগ, তোমার উচ্চাশা সবই আমি লক্ষ্য করেছি গভীর মনোযোগের সঙ্গে। তুমি তোমার সংশয়ের কথা বলেছ, তোমার ব্যর্থতার কথাও বলেছ; এমনকি তুমি তোমার উন্নাসিক সমালোচনা দিয়ে আমাকে উড়িয়ে দিতে চেয়েছ। কিন্তু তোমার কথার মধ্যে একবারও তুমি তোমার ঈশ্বর বা গুরুদেব সম্বন্ধে বিরুদ্ধ উক্তি কর নি। আমার একবারও মনে হয় নি তোমার বিশ্বাসের অভাব ঘটেছে একমুহূর্ত্তও; একবারও মনে হয় নি যে একটা চমৎকার জীবনযাত্রা ও সাংসারিক উন্নতিকে হেলায় বিসর্জ্জন দিয়েছ বলে তোমার মুহূর্ত্তের জন্যও কোন অনুশোচনা এসেছে। এর পর আমি তোমাকে সংশয়বাদী কী করে বলবো? যাক্‌গে, এ নিয়ে তোমাকে আর বিব্রত করতে চাই না। এস, অন্য কিছু আলোচনা করা যাক্। একটা কথা তোমাকে বলতে চাই: সেদিন ইয়েট্‌সের একটা লেখা পড়ছিলাম—ঈশ্বর মানুষকে সব কিছু দিতে পারেন। কিন্তু মানুষ শুধু দিতে পারে তার বিশ্বাস। তাঁর এই লেখাটি পড়ে আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। যীশুখ্রীষ্ট ঠিকই বলেছিলেন যে সাধারণ মানুষের আসলে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস নেই। তাই ত দিলীপ, শত্রুকে ভালবাসা উচিত এটা অন্তরে অন্তরে অনুভব করলেও, কার্য্যতঃ সেটা সম্ভব কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ হয়। যাই হোক্ আসল লক্ষ্যটার প্রতি দৃষ্টি রেখে চলা নিশ্চয়ই দুরূহ।"

তার গম্ভীর গলাটা যেন কেঁপে গেল—একমুহূর্ত্ত সে থামলো। তারপর আবার সে প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠলো।

"তোমার নির্জ্জনবাস ছেড়ে আমাকে দেখতে এসেছ তুমি। কী বলে তোমায় ধন্যবাদ দেব বল ত? কিছুদিন আমাদের সঙ্গে থেকে যাও, তুমি তাড়াতাড়ি চলে যেও না। তোমার হয়ত আমাদের কাছে কোন দরকার নেই, কিন্তু তোমাকে আমাদের দরকার আছে, তোমাকে আমরা চাই।"

সেদিন রাত্রে আকাশে আলোছায়ার লুকোচুরি দেখতে দেখতে আমার মনে হয়েছিল কোন লোকটি দুজনের মধ্যে বেশী জ্ঞানী—যে আইরীশ কবি বলেছিলেন:

"পরীদের হাত ধরে চলে এসো এখানে,
পৃথিবীটা কান্নার, হাসি নেই ওখানে।"

না সেই ইংরেজ কবি যিনি হেসে বলেছিলেন:

"উত্তপ্ত পৃথিবীটা সত্যই নিষ্ঠুর
ক্লান্ত আমাদের মন আর শরীর;
তবু এই পৃথিবীতে গর্ব্ব আছে
বেঁচে থাকার আনন্দ আছে;
সে কথা তুমি বোঝ আর নাই বোঝো।"

তারপর হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল শ্রীঅরবিন্দের সেই চিরস্মরণীয় চারটে লাইন:

"আমরা বলে দেব পৃথিবীকে
তাঁর চাতুরী আর লীলার কথা—
তাঁর অত্যাচার আর উৎপীড়নের কথা।
আমাদের কান্নায় তাঁর হাসি ফোটে
আমাদের দুঃখে তাঁর আনন্দ,
তারপর আমাদেরও হাসান তিনি
আনন্দে আর সৌন্দর্য্যে।"

এবার আমি সুভাষকে যেন নতুন এক আলোক সম্পাতে নতুন রূপে দেখতে পেলাম। এ আলোক শুধু আত্মার রাজ্যে পাওয়া যায়। পৃথিবীর দুঃখকষ্টকে আমি সমর্থন করতে পারি না, তাহলে ত হতাশাবাদী হয়ে পড়তে হয়। আমার মনে হ'ল আমাদের সব ক্রটীই অন্যায়' বাস্তববাদীয় এই যুক্তি যদি সত্য হয়, তবে 'সব অন্যায়ই চিরন্তন ন্যায়ের অগ্রপথ মাত্র' মায়াবাদীয় এই যুক্তিটা ত আরো বেশী সত্য। "কারণ অবিবেকপ্রসূত জীবন নীতিতে দোষ ক্রটী অসম্পূর্ণতা এগুলিও ঈশ্বরের বিভিন্ন অভিব্যক্তির পূর্ণাঙ্গ বিকাশের প্রথম স্তর।" আমি স্বীকার করি যে কেন এই দোষক্রটী অন্যায় অসম্পূর্ণতার প্রয়োজন হয়, তা আমি আজো বুঝতে পারি না। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বিচার করে দেখলে "অবিবেকপ্রসূত জীবন নীতির"

গভীরতা কতটুকুই বা আমরা বুঝি ? সেই রাত্রিতে ছাদে বেড়াতে বেড়াতে তারাগুলির দিকে তাকিয়ে আমার মনে হয়েছিল ওরা যেন মানুষের ক্ষুদ্র বুদ্ধিকে ব্যঙ্গ করছে—তার সঙ্গে সঙ্গেই চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল সেই কর্ম্মবাদীর মুখখানা যে সেদিন সন্ধ্যাতেই আমাকে বলেছিল তার অজস্র ব্যর্থতাও আশাভঙ্গের মধ্য দিয়ে সে অনুভব করেছে যে 'তাকে শুধু বিরোধীদের প্রতি উদার হলেই চলবে না তাদের ভালবাসতে হবে।' আমি দেখতে পেলাম সেই 'চিরন্তন ভাল'-টাকে—জীবনের আলোক-অন্ধকারে ; আনন্দ আর দুঃখের মধ্য দিয়ে যা ঈশ্বরের অভিব্যক্তিকে প্রকাশ করছে। সেই বিনিদ্র রাত্রিতে আমি সুভাষের প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতা বোধ করলাম।

আটাশ

আমার অনেক বন্ধুর সঙ্গে যখন সুভাষের সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়েছি তখন দেখেছি তারা সবাই ঠিক আমার মতে মত দেয় নি। হয়ত আমি তার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও প্রীতি বশতঃ তাকে অনেক বাড়িয়ে ফেলেছি। তবে এইটুকু আমি বলতে পারি নিরপেক্ষ হবার চেষ্টা করেছি তার চরিত্র-বিশ্লেষণ করতে গিয়ে, হয়ত সক্ষম হইনি। গ্যেটের এই কথাটা আমার বলতে ইচ্ছা হচ্ছে :

"শপথ করছি আমি আন্তরিক হ'ব,
কিন্তু নিরপেক্ষ হতে পারব কি না কে জানে ?
কয়জনই বা পারে ?"

তাঁর নির্ভীক স্বীকারোক্তি আমার খুব ভাল লাগে! আমি তাঁর মতই নিঃসন্দেহে বলতে পারি আমার আদর্শ অনুযায়ী তাকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা আমি করিনি, সে যা ছিল তাই শুধু বলতে চেয়েছি। তবু আমি যেন সেই বিনিদ্র রজনীর তারকাগুলির বিদ্রূপ দৃষ্টি দেখতে পাচ্ছি, তারা বলছে : "আমরা কতটুকুই বা জানি যে, যা অনুভব করি তাই ধ্রুব সত্য

একথা জোর করে বলতে পারি?" আমার মনে পড়ছে সুভাষ খুব জোরের সঙ্গেই বলত আমি জন্মখুঁৎখুঁতে নই। আমার মনে হয় সে এখানে ভুল করেছিল। আমি মোটামুটি ধরে নিচ্ছি একজন লোক তার নিজের সম্বন্ধে অপরের চেয়ে নিশ্চয়ই অনেক বেশী বোঝে। সেই সঙ্গে আমার সন্দেহ হয়, আমি তার সম্বন্ধে যা বলেছি তা কি অভ্রান্ত? হয়ত যা বলেছি তা ভুল—কে জানে? পৃথিবীর এই জোয়ার ভাঁটার মধ্যে পায়ের তলায় শক্ত-মাটি খুঁজে পাওয়া সত্যই দুষ্কর। তবু একথা বিশ্বাস করতে পারি না যে, তার প্রতি পক্ষপাতিত্ব নেই বলেই যে কেউ সঠিক চরিত্র বিশ্লেষণ করতে পারবে। তার সম্বন্ধে অন্য কোন বিপরীত ধারণা সত্য একথা আমি মানতে রাজী নই। কারণ প্রীতি এমনই জিনিষ যে তা মানুষকে একটা গভীর অন্তর্দৃষ্টি দেয় যা অন্য কিছুতেই সম্ভব নয়। আমি অন্ধ ভালবাসার কথা বলছি না, আমার মনে হয় যে ভালবাসা আমাদের চরিত্রকে উন্নততর করে তা কখনই অন্ধ হতে পারে না। প্রেমই প্রেমাস্পদের চরিত্রের যা কিছু দোষ ত্রুটি অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে দেখিয়ে দেয়। তার স্বধর্ম্মই তাই। সুভাষের প্রতি আমার প্রেম ও অনুরক্তি তার দোষ ত্রুটি সম্বন্ধে আমাকে অন্ধ করে দেয় নি একথা আমি জোর করেই বলতে পারি। অবশ্য একথা সত্য যে সেগুলির ওপর বেশী জোর দিতে চাই নি আমি। কারণ আমি শুধু তার চরিত্রের সেই দিকটাই দেখাতে চেয়েছি যা আমাকে প্রেরণা দিয়েছে, সাহায্য করেছে আমার দ্বিধা ও দুর্ব্বলতা মোচন করতে।

তা সত্বেও পাছে কেউ আমাকে ভুল বোঝেন সেই জন্য আমি একটা কথা এখানে বলতে চাই যে তার অক্ষশক্তির পক্ষে যোগ দেওয়াটা অত্যন্ত মারাত্মক একটা ভুল হয়েছিল বলেই আমি মনে করি। তার এই সিদ্ধান্ত ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের পক্ষে সহায়ক হতে পারে একথা কোন চিন্তাশীল ব্যক্তিই মানতে পারেন না। আমি এখনো দুঃখের সঙ্গে চিন্তা করি সুভাষ কী করে বিশ্বাস করতে পারলো যে জাপানের মত একটা নিষ্ঠুর সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বিনামূল্যে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার কাজে সহায়তা করবে। যে, কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি এ সম্বন্ধে জওহরলালের মতকেই

সমর্থন করবেন যে যে কোন বাহিনী ভারতবর্ষ আক্রমণ করুক না কেন তার পিছনে জাপান রয়েছে এইটাই সব চেয়ে সন্দেহের কারণ; এবং প্রত্যেকটি ভারতবাসীর সে বাহিনীকে বাধা দেওয়া উচিত। সৌভাগ্যক্রমে ভারতবর্ষে শেষ পর্য্যন্ত সে বিভীষিকা আসে নি। আরো আশার কথা মন্দের মধ্য থেকে একটা লাভও হয়েছে। ভারতীয় সৈন্যবাহিনী নিয়ে নেতাজী সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষকে মুক্ত করতে আসছেন, এই আশা ভারতবর্ষের জনগণ মনে প্রেরণার উৎস জাগিয়েছে। তারা পরাধীনতার গ্লানি আর আলস্য ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে স্বাধীনতা লাভের জন্য উন্মুখ হয়ে। মুক্তি স্পৃহার এই বন্যাবেগ ভারতীয় সেনাবাহিনীর মধ্যে পর্য্যন্ত এভাবে প্রবেশ করেছিল যে বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে পর্য্যন্ত স্বীকার করতে হয়েছিল (১৫ই মার্চ্চ, ১৯৪৬)—"হিন্দু, মুসলমান, শিখ, মারাঠা, রাজনীতিক, সরকারী চাকুরিয়া সকলের মধ্যেই স্বাধীনতার কামনা দৃঢ়তর হইয়াছে। আজ আমি মনে করি, যে সৈনিকরা গত যুদ্ধে অসীম বীরত্ব ও আনুগত্যের পরিচয় দিয়াছেন তাঁহারা পর্য্যন্ত আজ দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছেন। একথা অত্যন্ত স্পষ্ট যে ইংরাজরা যে আমাদের জাতীয় দাবীর প্রতি সহানুভূতিশীল হইয়া উঠিয়াছেন তাহার কারণ এই সৈনিকদের যুদ্ধজয়ের পক্ষে সহায়তা নয়; তাহারা যুদ্ধাবসানে কী করিয়া বসিবে সেই ভয়েই ইংরাজরা আমাদের স্বাধীনতার দাবীর প্রতি হঠাৎ দরদী হইয়া উঠিয়াছেন।" যাই হোক্, তাঁদের এই মনোভাবের পরিবর্ত্তনে ভালই হয়েছে—জাপানের সহায়তায় যদি ভারতীয় জাতীয় বাহিনী ব্রিটিশকে তাড়িয়ে দিতে পারত তবে সেটা ভারতবর্ষের পক্ষে মঙ্গলকর হ'ত না। চীন ও কোরিয়ার দৃষ্টান্তের পর, ব্রিটিশ বিদ্বেষে অন্ধ ছাড়া আর কেউ সন্দেহ করতে পারেন না যে সুভাষের দুঃসাহসিক অভিযান সফল হলে ভারতবর্ষে কী দুর্য্যোগ নেমে আসত। জাপান তার অক্টোপাশ বাহু দিয়ে আমাদের বেষ্টন করে শোষণ করত নিঃশেষে, হয়ত জার্ম্মানীও তার সঙ্গে ভাগ বসাত; আবার বহু বছর ধরে আরো দুঃসহ উৎপীড়ন ও অত্যাচারের মধ্যে আমাদের আর্ত্তস্বরে চীৎকার করতে হতো।

কিন্তু সুভাষ কী করে এ পথে পা বাড়ালো? সে ত এতটা অদূরদর্শী নয়। কোন

জাতি সম্বন্ধেই সে বিদ্বেষভাব পোষণ করতে পারত না, যদিও কখনও কখনও কোন দলের বিরুদ্ধে সে অত্যন্ত কঠোর হয়ে উঠত। (কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের বিরুদ্ধে যেমন হয়েছিল)। তাহলে কি করে সে সাম্রাজ্যবাদী জাপানের সঙ্গে হাত মিলালো? একটু অনুধাবন করলে হয়ত ব্যাপারটি বোঝা যেতে পারে। আমার মনে হয় হয় ব্যাপারটি ঘটেছিল এইভাবে:

আমি আগেই বলেছি সুভাষ সাধারণতঃ একটু অধীর প্রকৃতির লোক ছিল। আর তাছাড়া স্বভাবতঃই সে আবেগের বশে চলত বেশী। সেই জন্য যতই দিন যাচ্ছিল ততই সে অস্থির হয়ে উঠছিল। পরাধীনতার বোঝা আর তার ওপর তার ভগ্ন স্বাস্থ্য এই দুটোই তার অস্থিরতার প্রধান কারণ। তারপর সে কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত হল, তার মনে অত্যন্ত আঘাত লাগলো হাই কমাণ্ডের এই নির্দ্দেশে। পরাজয় স্বীকার করা তার স্বভাববিরুদ্ধ ছিল, সেই কারণেই সে ফরোয়ার্ড ব্লকের প্রতিষ্ঠা করলো। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সে বুঝতে পারলো কংগ্রেসের সংগঠিত বিরুদ্ধতার মধ্যে একে চালান খুব সহজ নয়। এলো অবশেষে ব্যর্থ আবেগের আশাভঙ্গ।

কিন্তু দুঃখ কখনো একা আসে না। ফরোয়ার্ড ব্লক প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাকে আবার গ্রেপ্তার করা হলো। কর্ম্মহীন নিরর্থক বন্দী জীবনযাত্রা তাকে যেন পাগল করে তুললো—শেষ পর্য্যন্ত সহ্য করতে না পেরে ১৯৪০-এর শেষের দিকে সে অনশন সুরু করলো জেলের মধ্যে। কিন্তু ১৯৪১ এর ২৬শে জানুয়ারী আরেকটা পরীক্ষা এগিয়ে আসছিল, কী হবে তা সে জানতো ভালভাবেই। তাই সে ভাগ্যকে পরাস্ত করার জন্য একটা দুঃসাহসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেললো—দেশত্যাগ করাই মনস্থ করলো। তার কাবুলের আশ্রয়দাতা উত্তমচাঁদের যে বিবরণী প্রকাশিত হয়েছে তা থেকে তার তখনকার মনের অবস্থা বেশ স্পষ্টই বোঝা যায়। প্রথমে সে রাশিয়া যাওয়াই মনস্থ করেছিল, অক্ষশক্তির কাছে নয়—এতে সকলেই খানিকটা স্বস্তি বোধ করবেন। আসলে সে যে সাম্যবাদকে পছন্দ করতো তা নয়, তবে সে ফ্যাসিবাদকে ঘৃণা করতো তার চেয়ে অনেক বেশী। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে একটা মস্তবড় ভুল হয়ে গেল। কাবুলে পৌঁছে সে

দেখলো, তার রাশিয়ান বন্ধুরা তাকে মস্কো নিয়ে যাবার জন্য খুব বেশী ব্যগ্র নয়। অথচ এদিকে আর ফেরার উপায় নেই, সুতরাং তাকে সোজা বার্লিনেই যেতে হলো। উত্তমচাঁদ বলেছেন: "পঁয়তাল্লিশ দিন ধরে বোসবাবু আমার কাছে ছিলেন—এর মধ্যে একদিনও তাঁর মুখ থেকে অক্ষশক্তির কোন প্রশংসাবাদ আমি শুনতে পাই নি। তিনি ব্রিটিশকে যেমন ঘৃণা করতেন, তাদেরও তেমনি ঘৃণা করতেন। আমি নিশ্চিত বলতে পারি বার্লিনে পৌঁছে সোভিয়েট দূতাবাসের সাহায্যে তিনি রাশিয়া যাবার জন্য আর একবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলেন। অবশেষে রুশ-জার্মান যুদ্ধ সুরু হল,—রাশিয়ায় যাওয়ার সব আশা তাঁর ধূলিসাৎ হয়ে গেল। ১৯৪১এর ২৮শে মার্চ্চ তিনি বার্লিনে পৌঁছান, রুশ-জার্মান যুদ্ধ সুরু হয় ২২শে জুন।

সুভাষ মোটেই ফ্যাসিষ্টপন্থী ছিল না, জাপানের সহায়তা ভিক্ষা একটা নিছক দৈবদুর্বিপাক ও ঘটনাচক্র মাত্র। আমি একথা বলতে চাই না যে গোড়া থেকেই সে ভাগ্যদেবীর হাতের পুতুল হয়ে চলছিল। আমি বলতে চাই যে একটা ভুল পদক্ষেপের ফলে মানুষ এমন একটা খাদ বা আবর্ত্তে গিয়ে পড়ে যেখান থেকে উঠে আসা আর সম্ভব হয় না। যাই হোক কাউকে বিচার করার চাইতে তাকে বোঝবার চেষ্টা করাটা অধিকতর যুক্তিযুক্ত। শ্রীঅরবিন্দ একবার লিখেছিলেন: নীতিবাদীরা, ঔপন্যাসিকরা ও নাট্যকাররা দেখাতে চান যে মানুষের কাজের পিছনে আছে চিন্তা, তাই প্রত্যেকটি কাজের জন্য সে দায়ী; কিন্তু আসলে মানুষ সবসময় ভেবে কাজ করে না। মানুষ যে কাজ করে, তার কতখানি উদ্দেশ্য প্রসূত, বা সৎ ইচ্ছাকৃত, তারচেয়ে কোন্ ঘটনাচক্রে কোন্ শক্তির বশে যে কাজ করে সেইটাই আমার কাছে বেশী অনুধাবনযোগ্য। আমাদের অনুমান অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভুল হয়, এবং যখন তা সত্য হয়, তখনও শুধু ভাসাভাসা—নিগূঢ় স্বচ্ছ-সত্য নয়।"

সুভাষ ঘটনাচক্রের আবর্ত্তে আধি-পীড়িত হয়ে রুদ্ধ আবেগের একটা প্রকাশ খুঁজতে গিয়ে দুঃসাহসিক অভিযানে নেমে পড়েছিল। আমি এ কথা অবশ্য বলতে চাই না যে তার এ সিদ্ধান্ত ঠিকই হয়েছিল। আমার মনে হয় জওহরলাল ও তাঁর সহকর্মীদের মত সুভাষেরও ভারতবর্ষেই থাকা উচিত

ছিল আসন্ন বিবাদের সঙ্গে মুখোমুখি সংগ্রাম করার জন্য। ফ্যাসিষ্টদের সঙ্গে তার যোগাযোগ সমর্থন করি না। কিন্তু নিঃসঙ্গতার বেদনা অত্যন্ত দুঃসহ; একমাত্র সেই 'পরম জ্ঞানের' কাছে আত্মনিবেদন করা ছাড়া অন্য কোন মুক্তির পন্থা নেই এ থেকে। হয়ত তাই সে একটা সঙ্কট মুহূর্ত্তে একটা অবিবেচনার কাজ করে ফেললো—তারপর কর্ম্মের যথা পরিণতি ঘটলো।

আমি যে এত কথা বলছি তা তাকে বিচার করার জন্যও নয়, বা তার পক্ষ সমর্থন করার জন্যও নয়। আমি সুভাষের স্মৃতিকথা লিখতে বসেছি প্রধানতঃ দুটো উদ্দেশ্য নিয়ে, একটা হলো মানুষ হিসাবে সে যা আমাদের দিতে পেরেছে তার জন্য শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়া, দ্বিতীয়তঃ লোকে যাতে তাকে ঠিকভাবে বুঝতে পারে সেই উদ্দেশ্যে। শক্তির মোহে আর জয়ের আশায় সে ভুল করেছে অনেক, কিন্তু মানুষ হিসাবে যে শ্রদ্ধা ও ন্যায় বিচার তার প্রাপ্য সেটা ত তাকে দেওয়া উচিত।

হয়ত 'আশা' আর 'মোহ' এ দুটো কথা ব্যবহার না করলেই ভাল হ'তো। কথা দুটোয় যেন মায়াবাদের স্পর্শ এসে পড়ে। কিন্তু যখন কেউ কায়ার পিছনে ছুটে শেষ পর্য্যন্ত ছায়াটাকেই ধরতে যায়, তখন 'আশা' আর 'মোহ' ছাড়া আর অন্য কোন্ কথা ব্যবহার করা যায়? আত্মচেতনার প্রথম অভ্যুদয়ে মানুষের যে প্রথম অভিজ্ঞতা লাভ হয়, সেটাকে 'মায়া' বা 'আশা' ছাড়া আর কি বলা যায়? তাছাড়া অনাদি কাল থেকে মানুষ প্রকৃত সত্যের পলক দৃষ্টি মাত্র লাভ করেছে—সে সত্যের কাছে আমাদের বাস্তব জীবনের আনন্দ সম্ভার তুচ্ছতম ও অত্যন্ত নগণ্য মনে হয়। মানুষের এই দুটি চিরন্তন অনুভূতির কথায় মনে পড়ে যায় উপনিষদের সেই পরমবাণী "তদেব ব্রহ্ম ত্বাং বিদ্ধি নেদম্ যদিদম্ উপাস্তে।"

মরমী সুভাষের এই সত্য উপলব্ধি করতে বেশী দেরী হয় নি। পূর্ণ ষোল বৎসর কাল জীবনের সব কিছু উৎসর্গ ক'রে দেশমাতার দাসত্ব শৃঙ্খল মোচনের চেষ্টা করার পরও তাকে অত্যন্ত বীভৎস দুর্দ্দশার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, তার অত্যন্ত বলিষ্ঠ আশাবাদ থাকা সত্ত্বেও তা তার কাছে অসহণীয় হয়ে উঠেছিল। শেষ পর্য্যন্ত দেশ সেবার চরম পুরস্কার

স্বরূপ দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান থেকে সে বিতাড়িত হলো। তখন সে বুঝতে পারলো তরুণ আদর্শবাদের কাছে যা অত্যন্ত মনোরম বলে মনে হয়েছিল পৃথিবীটা তত সহজ এবং সুন্দর নয়। মানুষের কাছে খুব বেশী কিছু আশা করা আর একটা কঙ্কালকে জীবনদানের আশা করা প্রায় একইরূপ। আমি কিছুমাত্র বাড়িয়ে বলছি না। আমি দেখেছি রাজনৈতিক সংঘর্ষের আঘাতে ও ব্যর্থতায় প্রথম প্রথম সে শুধু মাত্র একটু বিচলিত হত, তার পর দেখেছি তাকে ব্যথা অনুভব করতে; শেষ পর্য্যন্ত দেখেছি সে পাষাণের মত কঠোর হয়ে উঠেছে। আমরা যখন চিন্তা করে দেখি যে তার দেশবাসী তাকে ভুল বুঝেছে, গাল দিয়েছে, তার সহকর্ম্মীরা তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, এমন কি তার বন্ধুরা পর্য্যন্ত তার অকৃত্রিম দেশ সেবার পিছনে ব্যক্তিগত ক্ষমতা লাভের স্পৃহা আছে বলে নানারকম মন্তব্য প্রকাশ করেছে, তখন তার পক্ষে ক্রমশঃ কঠোর ও রুক্ষ হয়ে ওঠাটাই স্বাভাবিক বলে মনে হয়। আমি একথা বলতে চাই না যে সবসময়েই অপর পক্ষ ভুল করে থাকেন। নৈর্ব্যক্তিকভাবে বিচার করতে গেলে আমাদের সম্বন্ধে আমাদের শত্রুদের ধারণাই অধিকাংশ পরিমাণে ঠিক হয়। কিন্তু মুস্কিল হল এইখানে যে সুভাষের মত লোকের পক্ষে তীব্র সংগ্রামের মধ্যে অপরের মতটাকে বেশী মূল্য দেওয়া অত্যন্ত শক্ত। এ সময় অপরের সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গী তার কাছে উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলেই মনে হত। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর "লাইফ ডিভাইন" গ্রন্থে বলেছেন "অজ্ঞানতা হলো জ্ঞানের জ্যোতিষ্কের চারিপাশে ছায়াচ্ছটা। মানুষের প্রত্যেকটি ভ্রম সত্য-আবিষ্কার-প্রচেষ্টারই পরিচয় দেয়, প্রত্যেকটি দুর্ব্বলতা ও ব্যর্থতা শক্তি ও সফলতার অনন্ত সমুদ্রের সন্ধান দেয়, প্রত্যেকটি বিচ্ছেদ ও পার্থক্য বিবিধ মিলনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে পরম মিলন ও ঐক্যের আনন্দকে গভীরতর ক'রে তোলে।" কিন্তু মুস্কিল হল যখন আমরা আবেগোন্মত্ত না হয়ে প্রকৃতিস্থ থাকি তখন সাধারণ দৃষ্টিতে এই সত্য পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, আর যখন আবেগের জোয়ারে আমাদের সাধারণ বিচারবুদ্ধি ভেসে যায়, তখনই এই সাধারণ স্বচ্ছ দৃষ্টি লোপ পায়। প্রত্যেকটি শক্তিমান্ কর্ম্মবাদীর সমগ্র জীবনে

তাই ঘটেছে, বিশেষ করে তাদের কর্মক্ষেত্র যদি রাজনীতির ঘূর্ণ্যাবর্ত্তা হয়। এরই ফলে সুভাষ অস্থিরতা ও অস্বস্তি বোধ করত, কারণ জীবনে সে যা চেয়েছিল তার বিপরীতটাই ভাগ্যে জুটেছিল। শেষ পর্য্যন্ত এই অশান্তি যখন দুঃসহ হয়ে উঠলো তখন সে আবেগের কাছে আত্মসমর্পণ করে শান্তি পেতে চাইলো কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেখানেও সে ব্যর্থ হলো। এর পর আর ত অন্য উপায়ও রইলো না। আমার মনে হয় তার জীবনে যদি এইরকম বিরোধ-ব্যর্থতার সংঘর্ষ না হতো, তাহলে সে কখনই ভাগ্যদেবীর হাত থেকে জয়মাল্য ছিনিয়ে আনার জন্য শয়তানের অনুচরদের সাহায্য ভিক্ষা করতে যেত না। বিপথে চালিত হলেও অদম্য একটা ইচ্ছাশক্তির কাছে পরাজয় না মেনে উপায় থাকে না। তা ছাড়া শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী মায়াবাদীরা বলেন ভুল করাটার পিছনেও লীলাময়ের লীলা চলে কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য। সুভাষের রাজনৈতিক ভ্রান্তিগুলির সম্বন্ধে এই কথা যে কত খাটে তা নিশ্চয়ই বোঝাবার দরকার নেই। আমি শুধু এইটুকুই বলতে চাই যে তার অনমনীয় ইচ্ছাশক্তি ও আদর্শবাদের প্রতি প্রগাঢ় আস্থার ফলেই এই আশ্চর্য্য বিপর্য্যয় ঘটতে পেরেছিল। হয়ত তার আদর্শবাদের প্রতি এই প্রগাঢ় আস্থা আমাদের কাছে বোধগম্য নয়, তবু সুভাষের কাছে এইটাই ছিল সত্য।

সুভাষের চরিত্রে দৈন্য ছিল না, সে ছিল বিরাট্ পুরুষ, সারাজীবন ধরে সে একটা বিরাট্ কিছুকে রূপ দিতে চেয়েছে। সে ছিল বিপ্লবী, সে ছিল জন্ম-মরমী। এই আমার গর্ব—আজো এ কথা মনে হলে আনন্দে আমার বুক নেচে ওঠে যে সুভাষ ছিল মহান্। প্রায় পঁচিশ বছর আগে একদিন রাত্রে সে আমাকে তার এই গভীর আদর্শ উপলব্ধির কথা বলেছিল—সে রাত্রিটি আমার কাছে অবিস্মরণীয়।

উনত্রিশ

আমরা তখন ল্যাঙ্কাশায়ারে ডাক্তার ধর্মবীরের বাড়ীতে থাকি। একদিন আগুনের ধারে বসে আমরা আলোচনা করছিলাম ইংলণ্ডের শ্রমিক দল আর রাশিয়ার সাম্যবাদের অভ্যুত্থানের কথা। বলে রাখা ভাল যে আমি তখন

মার্ক্সের একজন পরম ভক্ত ছিলাম। তখন ভাবতাম এর চেয়ে কোন অহিংস উপায়ে স্বর্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হতে পারেনা।

খুব উৎসাহের সঙ্গে আমি বল্লাম—"শ্রমিকদল যখন ক্ষমতা অধিকার করবে তখন বিরাট্ একটা কিছু ঘটবে মনে হয়। সুভাষ তুমি কি বলো?"

সুভাষ ভ্রূকুঞ্চিত করে বললো: "কেমন করে, শুনি?"

আমি বেশ দমে গিয়ে আমতা আমতা করে বল্লাম, "মানে, আমরা যা চাই তাই পাবো, এই আর কি!"

"অর্থাৎ ভারতবর্ষের রাজনীতিক্ষেত্রে একটা বড় কিছু পরিবর্ত্তন হবে মনে করো তুমি? এ আশা স্বপ্নেও মনে ঠাঁই দিও না।"

তার তীক্ষ্ণ মন্তব্যে আমি একটু উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। "কেন, হবে না কেন? সব জাতির বঞ্চিতরাই ত এক।"

সে আমার মুখের দিকে তার তীক্ষ্ণ চোখ দুটো রেখে বলতে লাগলো! "অর্থাৎ ভূমিকাটা বাদ দিয়ে সোজা বলা যায় সর্ব্বহারার একনায়কত্ব! এই তো?"

আমি কোন উত্তর দেবার আগেই সে আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললো: "তার চেয়ে আলাদীনের আশ্চর্য্য প্রদীপের গল্পটাকে বিশ্বাস করতে রাজী আছি!"

আমি মর্ম্মাহত হয়ে বলতে গেলাম: "দেখো সুভাষ—"

ততক্ষণে সে উঠে দাঁড়িয়েছে। তার গলার স্বর শুনে মনে হলো যেন কোন ধর্ম্মপ্রচারক উপদেশ দিচ্ছেন। সে বললো, "দেখো দিলীপ, আমাদের মধ্যে যাঁরা আশা করেন যে বিদেশীর দরজায় আবেদন নিবেদন করে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পেয়ে যাবে, তাঁরা অত্যন্ত ভুল করছেন। তাঁদের আশার বুদ্বুদ শীঘ্রই মিলিয়ে যাবে।"

"তুমি কি বলতে চাও যে ভারতবর্ষের বাইরে যা ঘটছে, তার কোন প্রতিক্রিয়াই ভারতবর্ষে হবে না?"

"এতদূর আমি বলতে পারি না। তবে এইটুকু আমি বলতে চাই যে আমাদের মুক্তি সাধনের জন্য অপরে কিছু করতে পারে না; আরো স্পষ্ট করে যদি শুনতে চাও ত বলবো—তারা কিছু করবে না।"

"তারা করবে না, একথা তোমার মনে হলো কেন?"

"করবে না, কারণ নিঃস্বার্থভাবে কেউ অপরকে সাহায্য করে না—রাজনীতিক্ষেত্রে ত নয়ই। মীরজাফরের কথা ধরো। তুমি যেমন ইংলণ্ডের শ্রমিক দল ও রাশিয়ার সাম্যবাদীদের সম্বন্ধে আশা নিয়ে বসে আছ, তেমনি সে-ও ত ভেবেছিল ক্লাইভ তাকে সিংহাসনে বসিয়ে দিয়ে অনুগত সেবকের মত তার হাতে খাজনা পৌঁছে দিয়ে যাবে নিঃস্বার্থভাবে। না দিলীপ, স্বদেশীযুগে অরবিন্দ ঘোষ যে বলেছিলেন কোন বিদেশীই ভারতবর্ষকে সাহায্য করবে না, এ কথা সত্য। স্বাধীনতা অর্জ্জন করা আমাদেরই কাজ—আমরা যদি না পারি ত আর কেউ তা নিয়ে মাথা ঘামাবে না।"

আমি গম্ভীর হয়ে গিয়ে বল্লাম "কথাটা বলা ত খুব সহজ-ই। কিন্তু আমাদের মধ্যে দলাদলি, আর এত সংগঠনের অভাব যে একসঙ্গে কিছু করাটাই যে শক্ত।"

"সেইজন্যই ত আমাদের স্টো শেখা উচিত।"

এ কথার কী উত্তর দেব এর আমি ভেবে পেলাম না। "আচ্ছা—তারপর?"

সুভাষ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে একটু হাসলো। কিন্তু তার চোখে সেই সুদূরের দৃষ্টি, হঠাৎ যেন সে অন্য জগতে চলে গিয়েছে। তারপর সেইভাবে ধীরে ধীরে সে যেন উচ্চারণ করলো—"তারপর—বিপ্লব।"

উৎসাহে আমি যেন নেচে উঠলাম তার এই কথায়। এর আগে কোন বিপ্লবীর সাহচর্য্যে আমি আসি নি। তারপরেই হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে ওঠার জন্য আমি লজ্জিত হয়ে হাসবার চেষ্টা করলাম। জোর করে চাঞ্চল্য দমন করে বললাম: "কিন্তু এখন কে-ই বা রাশিয়ার ভাবধারা ভারতবর্ষে আনতে চায়?" সুভাষ উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলো; "কী আশ্চর্য্য! বঙ্গ ভঙ্গ, 'আনন্দমঠ' অরবিন্দ ঘোষের কথা কি তুমি শোনো নি? রাশিয়া! রাশিয়ার বিপ্লবীরা যখন হাতেখড়ি সুরু করেছে, তখন আমরা এগিয়ে গিয়েছি বহুদূর।"

আমি বিরক্তভাবে বললাম "সে কথা আমাকে বলে দেবার দরকার নেই, আমি জানি। আমি বাবার সঙ্গে তাঁর গানগুলি গেয়ে বেড়িয়েছি রাস্তায় রাস্তায়।"

সুভাষ একটু শান্ত হলো, তার পরমুহূর্ত্তেই আবার সুরু করলে: "হ্যাঁ, সে একদিন গিয়েছে। আমি তখন শিশু, কিন্তু তোমার বাবার সেই স্বদেশী গানগুলি আমার রক্তের মধ্যে মিশে গিয়েছে—'ধনধান্যে পুষ্পে ভরা' 'বঙ্গ

আমার জননী আমার', 'ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে', 'মেবার পাহাড়'। সত্যি দিলীপ, তোমার বাবা ছিলেন আশ্চর্য্য লোক।"

আমি বাবার গর্ব্বেই গর্ব্বে অনুভব করে বললাম, "হ্যাঁ, বাবা আশ্চর্য্য লোকই ছিলেন। কিন্তু আমাদের আলোচ্য বিষয় থেকে কোথায় চলে এসেছি বল ত? আমি বলতে চাই—মানে…সেদিনগুলোকে ত আর ফিরিয়ে আনা যায় না।"

সে প্রতিবাদ করে বললো—"কেন যাবে না?" মানুষ যা করেছে, মানুষে চেষ্টা করলে তা পারে!"

আমি বল্লাম—"কথাটা সত্যি। কিন্তু এও ত সত্যি যে প্রতিভা যেমন তৈরী করা যায় না, তেমনি বিরাট কোন আন্দোলনও চেষ্টা করে তৈরী করা যায় না, আপনা থেকেই তার জন্ম হয়। বিরাট কোন আন্দোলন সেই যুগের চিন্তা-ধারার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি নয় কি?"

"কী বলছ, কী বলতে চাও তুমি?"

হঠাৎ সুভাষের এ প্রশ্নে আমি বেশ একটু হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম। কথাটা আমি রাশিয়া সম্বন্ধে একটা বইয়ে পড়েছিলাম। আলোচনা প্রসঙ্গে বলে ফেলেছি আমার বক্তব্যটাকে জোরালো করার জন্য। সাহিত্য, সংগীত আর শ্রীরামকৃষ্ণ ছাড়া আমি অন্য কোন বিষয়ে গভীরভাবে কোনদিন এর আগে ভাবিনি। কিন্তু ইংলণ্ডে তখন সবার মাথাতেই রাজনীতি ও সমাজতন্ত্রবাদের হাওয়া বইছে। সুতরাং আমাকে কয়েকটা গালভরা কথা শিখে নিতে হয়েছিল দামী কিছু বলার ঠাট বজায় রাখার জন্য; কিন্তু তার কোনটারই ঠিক মানে আমি বুঝতাম না। এবার হলো মহা বিপদ। আমি যেন গভীর জলে পড়ে অপটু সাঁতার-শিক্ষার্থীর মত হাত পা ছুঁড়ছি, ভয় হচ্ছে এখুনি বুঝি ডুবে যাবো।

একটু মিইয়ে গিয়ে বলি "আমি বলছি, মানে স্বদেশী যুগে আমাদের বিপ্লব ছিল গুপ্ত আন্দোলন মাত্র।"

"তাতে কী হয়েছে?"—সে আমার মুখের দিকেতাকিয়ে বল্লে।

আমাকে এবার যেন বুদ্ধির পরীক্ষা দিতে হচ্ছে। বল্লাম, "আমি বলছি, প্রথমতঃ তখন এটা না হয়ে উপায় ছিল না। কিন্তু এখন কি তা হবে? দ্বিতীয়ত,—

আমি বলতে যাচ্ছিলাম—যখন এই আন্দোলন সম্পূর্ণ সফল হয়নি, মানে স্বাধীনতা যখন আমরা পাইনি"—

হতাশ হয়ে কথাটা শেষ না করেই মাঝ পথে হাল ছেড়ে দিলাম।

সে বলে যেতে লাগলো: "এ ধরণের আন্দোলনকে ওভাবে বিচার করতে গেলে চলে না। এর পর তুমি হয়ত বলবে সীন্‌ফিন্‌ আন্দোলনও ব্যর্থ হয়েছে কারণ তার ফলে মুক্তি আসেনি। যখন সেদিন ডি ভ্যালেরাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল তখন কে ভেবেছিল যে তিনি মুক্তি পেয়ে আবার গ্রেপ্তার হবেন, তারপর লিঙ্কন জেল থেকে পালিয়ে আমেরিকায় গিয়ে আয়ারলণ্ডের রিপাবলিকান আন্দোলনের জন্য যাট লক্ষ ডলার তুলতে পারবেন? জাতীয় স্বাধীনতার জন্য মুক্তি সংগ্রাম একটা ডিনামাইটে আগুণ ধরিয়ে দেওয়া নয় যে বহুবৎসরের বন্দীশালার প্রাচীর হঠাৎ একবারে ভেঙে পড়বে। এ হলো কঠোর পরিশ্রমে একটার পর একটা পাথর গেঁথে শক্তির কঠিন দুর্গ রচনা করা। এই দুর্গ ছাড়া প্রতিষ্ঠিত শাসন ব্যবস্থাকে সংগ্রামে আহ্বান করাই বাতুলতা। এই শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাংলাদেশে যে বিপ্লবী আন্দোলন হয়েছিল সেইটাকেই প্রকৃত আন্দোলন এইজন্য বলছি যে, এর ফলেই সর্ব্বপ্রথম আমাদের পদানত দেশের অসহায় জাতি তার শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছে। এই আন্দোলনের ফলেই জাতীয় জাগরণের প্রথম উন্মেষ হয়েছে—আমরা বুঝতে পেরেছি যে বিশাল সংগঠিত শাসকশক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করার মত ক্ষমতা আমাদের আছে। আমরা নিজেরা নিজেদের ভাগ্যের নিয়ন্তা হতে না শিখলে অপর কেউ আমাদের জন্য অঙ্গুলি হেলন করেও সাহায্য করবে না। যে জাতি যতখানি উপযুক্ত হতে পারে তার শাসন ক্ষমতা সে তেমনি পায়—এই হলো ইতিহাসের ধারা।"

তার বিশ্বাসের দৃঢ়তায় আমিও যেন তার কথা মেনে নিতে সুরু করেছিলাম। কিন্তু তার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আমার সন্দেহ সংশয় আবার ফিরে এলো! একটু চুপ করে থেকে আমি বল্লাম: "তুমি কি বলতে চাও যে, স্বাধীনতা পাবার উপযুক্ত পন্থা হচ্ছে···মানে···আমি কি বলছি, তুমি বুঝতে পারছ নিশ্চয়ই?"

"তুমি কথাটা উচ্চারণ করতে এত ভয় পাচ্ছ কেন?"

"আমি ঠিক ভাগ্যকে খণ্ডন করার কথা বলতে চাই নি। আমি বলছি, সন্ত্রাসবাদের কথা—রক্তপাত, হিংসার পথ..."আমার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে গেল।

"ওরকম কোরো না দিলীপ, জীবনটা কি ঝরণা, রামধনু আর চাঁদের আলোর শোভাযাত্রা? তা হলে অবশ্য খুবই ভাল হতো। কিন্তু পৃথিবীর মানুষ আমরা, প্রতি সপ্তাহে প্রতি দিন প্রতি ঘণ্টায় বাস্তবের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হয় আমাদের। আমি স্বীকার করছি পথটা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়, হয়ত তা কদর্য্যই। কিন্তু তবু হয়ত এর একটা নিজস্ব ভীষণ সৌন্দর্য্য আছে—যদিও সে-সৌন্দর্য্য তার একান্ত পূজারী ছাড়া আর কেউ অনুভব করতে পারে না। কিন্তু এছাড়া উপায় কি বলো? এমন কি যখন শত্রুকে ঠিক সহজে দমন করা যাচ্ছিল না তখন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকেও চাতুরীর আশ্রয় নিতে হয়েছিল।"

"কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছ যে শ্রীকৃষ্ণের হাতে সংগঠিত সেনাবাহিনী ছিল; কিন্তু আমাদের আছে শুধু দেশপ্রেমের বন্যাবেগ মাত্র। সে বন্যাবেগ যখন আসে তখন তা প্রচণ্ড হয়েই আসে বটে, কিন্তু সব সময় ত তা স্থায়ী হয় না। যখন সে বন্যাবেগে ভাঁটা পড়ে, তখন?"

সুভাষ হঠাৎ আমার চোখের ওপর সোজা তাকিয়ে বলল "তুমি কি কখনো নদীর ধারে বাস করেছ?"

"না, কেন?"

"কটকে আমার শৈশবকাল কেটেছে, আমি জানি। ব্যাপারটা খুবই আশ্চর্য্য সন্দেহ নেই,—কারণ তুমি এখুনি যে উপমাটা দিলে, তার ফলে তুমি নিজের কথাতে নিজেই হেরে গিয়েছ। নদীতে ভাঁটা আসে বটে, কিন্তু সে ত আরো বেগে জোয়ার আসার আয়োজন করে—বিশেষভাবে বর্ষাকালে ত বন্যাবেগ প্রচণ্ডতম হয়ে ওঠে। আমি কৌতূহলী হয়ে লক্ষ্য করতাম: মাটির প্রাচীরে তারা ধাক্কা দিত জোয়ারের সময়, কিন্তু মনে হত পরাজিত হয়ে ফিরে যাচ্ছে তারা মাথা নীচু করে। কিছুক্ষণ পরে তারা আবার আসতো, আরো জোরে এবার আঘাত করতো। জোয়ার-ভাঁটার খেলা চলতো বারবার। কিন্তু আঘাত থামতো না, তীর ক্রমশঃ দুর্ব্বল হয়ে পড়তো, অবশেষে একদিন ধ্বসে পড়তো তার একটা অংশ, তলিয়ে যেতো সেই আবর্ত্তে, জয় হতো নদীর স্রোতের;

যেখানে ছিল মাটির প্রাচীর সেখানে দেখা গেল কল্লোলময়ী বিজয়ী স্রোতোধারা। এ শুধু কথার কথা নয় দিলীপ, বাস্তব সত্য। এখন হয়ত খুব শান্ত মনে হচ্ছে —কিন্তু এ নিস্তব্ধতা ঝড়ের পূর্ব্বাভাস।"

"তুমি বলছ যে প্রস্তুতি চলেছে?"

"নিশ্চয়ই। তবে সম্পূর্ণ ওড়ার ক্ষমতা না হওয়া পর্য্যন্ত পাখীগুলোকে এবারে আর ছাড়া হবে না। সেই নবীন প্রত্যূষে গান গাইবে না তুমি শিল্পী? তুমিই ত সেদিনকার সমবেত সঙ্গীতের হবে উদ্গোক্তা।"

ওর তরুণ মুখমণ্ডল সেই ভবিষ্যৎ দিনের অরুণচ্ছটায় যেন লাল হয়ে উঠলো—স্বচ্ছ হয়ে উঠলো আমার চোখে। তার সেই দৃঢ় ওষ্ঠের রেখাগুলো আজ পর্য্যন্ত আমার স্পষ্ট মনে পড়ছে। আমার বুকে যেন তোলপাড় সুরু হয়ে গেল।

সে হেসে বলল—"ওহে শিল্পী, বাস্তব জগতে নেমে এসো এবার। বাইবেলের কথাটা মনে রেখো: সেদিন শুধু ভজন আর আবাহন সংগীতই হইবে না, ক্রন্দন ও দন্তঘর্ষণও শুনিতে পাওয়া যাইবে।"

আমার বুকের তোলপাড় তখনো থামেনি। বল্লাম "তুমি কি সত্যিই বলছ, সুভাষ—ঠিক?"

"সত্যি নয় তার মানে? নিশ্চয়ই সত্যি। আমি তাদের চিনি, সকলকে না হোক অন্ততঃ অনেককে ত চিনি। আমি হয়ত তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েও ফেলতাম, কিন্তু ভেবেছি একেবারে দলভুক্ত হয়ে পড়া আমার উচিত হবে না।' সে থামলো, তার চোখে সেই সুদূরের দৃষ্টি। বিষণ্ণভাবে সে বললো: 'কে জানে, হয়ত এখনো অপেক্ষা করতে হবে—যতদিন না সেই মহালগ্ন আসে।'

আমি হতবাক্ হয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মত বসে রইলাম। আমার অবস্থা দেখে তার যেন মায়া হলো—আমার দিকে তাকিয়ে সে হাসলো—"আজ যে এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবার আশা বা সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, তা এই স্বদেশীযুগের বীরদের জন্যই। তুমি কি সেই আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে বলতে চাও? তুমি এর বিরাট সৌন্দর্য্য অনুভব করতে পারছ না?—এর পিছনে যে নৈতিক সাহস রয়েছে যার বলে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের শিশু সংগঠন ব্রিটিশসিংহকে যুদ্ধে আহ্বান করলো, তা

সত্যি এতই রোমাঞ্চকর যেন বিশ্বাস করতে পারা যায় না, অথচ এত সত্য যে অবিশ্বাসও করা যায় না।'

ত্রিশ

তার অনেক বছর পরে যখন শুনলাম সুভাষ বর্ম্মায় ভারতীয় জাতীয় বাহিনী গড়ে তুলছে তখন এই দিনের ছবিটা আমার মনে ভেসে উঠল। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অথচ স্নেহশীল আবেগময় আর কমনীয় তার সেদিনের মুখখানা আমার মনে গাঁথা হয়ে গিয়েছে। বহুদিন আমার মনে পড়েছে তার দুটো অত্যন্ত প্রিয় বাণী: রবীন্দ্রনাথের 'জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন,' আর ডাণ্টনের 'ওদের পরাজিত করতে হলে স্পর্দ্ধা চাই, আরো স্পর্দ্ধা চাই, ঔদ্ধত্য চাই, নিজেদের ওপর আস্থা চাই।'

আমার মনে হত সে স্বপ্নাশ্রয়ী আদর্শবাদী—তার দুঃসাহসিক চরিত্রের মধ্যে ছিল মায়াবাদের প্রতি, অজানা রহস্যের প্রতি একটা দুর্নিবার আকর্ষণ; তাই বারবার সে অজানার সন্ধানে সব কিছু ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে চাইত। আধুনিকরা হয়ত মায়াবাদে বিশ্বাস করেন না, তাঁরা বলবেন আমার সুভাষ-চরিত্র বিশ্লেষণ নিতান্তই মনগড়া। তাঁরা বলবেন—"সুভাষ বিপ্লবী ছিলেন ঠিকই, কিন্তু তাঁকে মায়াবাদী বলা বাতুলের প্রলাপ। তিনি ছিলেন অসম-সাহসী বীর, বাস্তববাদী সংগঠনকারী।"

কিন্তু আমার মতে যিনি শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ যোগী তাঁর কাছে বহুবছর থাকার পর বুঝতে পেরেছি প্রকৃত যিনি বিপ্লবী তিনি মায়াবাদের পূজারী না হয়ে পারেন না—মায়াবাদই তাঁর চরিত্রে পূর্ণতা অর্পণ করে। হয়ত একটা জীবনে তিনি মায়ার উচ্চতম শিখরে পৌঁছাতে পারেন না।

কিন্তু বিপ্লবী প্রেরণার বীজ একবার উপ্ত হলে, উচ্চতম শিখরে না পৌঁছান পর্য্যন্ত তার মৃত্যু ঘটে না। এঁদেরই পৃথিবী শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী বলে গ্রহণ করে। সর্ব্বযুগে সর্ব্বদেশে এঁরা যেন অপরিচিতই রয়ে যান, এবং সবচেয়ে বেশী অবিচারও এঁদেরই সহ্য করতে হয়। আমাদের সাধারণ নীতি-জ্ঞান তাঁদের বিচলিত করতে পারে না তাই তাঁরা রয়ে যান অপরিচিত

রহস্যময়। আর ছোটখাট প্রীতি ভালবাসাকে ত্যাগ করে মহত্তর কিছুর জন্য জীবনোৎসর্গ করার আহ্বানকে আমরা ভয় করি, দূরে সরিয়ে দিই তাই তাঁরা আমাদের হাতে অবিচারই পান।

অত্যন্ত কাছ থেকে সুভাষের চরিত্র বিশ্লেষণ করার সুযোগ আমার ঘটেছে। তাই আমি আজ আরো জোরের সঙ্গে বলতে পারি বিপ্লবী প্রেরণা আর মায়াবাদের প্রেরণার মধ্যে একটা মূলগত সাদৃশ্য ও সম্পর্ক আছে। সেইজন্যই সে একদিকে যেমন আত্মিক প্রেরণার মধ্য দিয়ে চিদ্বিপ্লবের আহ্বানে আকুল হয়ে উঠত তেমনি অপর দিকে শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার মধ্য দিয়ে অজানার গহ্বরে প্রবেশ করার জন্যও ব্যগ্র হয়ে উঠত। আমার মনে হয় সে যদি আত্মিক প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সেই আহ্বানে সাড়া দিত তাহলে তার পক্ষে আত্মোপলব্ধির সর্বোচ্চ শিখরে ওঠা সহজ হতো। কিন্তু সে তা পারে নি, বা ইচ্ছা করেই করে নি। আত্মার গভীর আহ্বানে সে সাড়া দেয় নি; এই জীবনেই তাই তাকে আত্মবিকাশের চেষ্টা করতে হয়েছে। মহত্তম প্রেমের পথ সম্মুখে খোলা থাকা সত্ত্বেও কেন যে মানুষ ক্ষুদ্রতরের পিছনে ছোটে, তা হয়ত শেষ শিখরে না পৌছান পর্য্যন্ত অজ্ঞাতই থেকে যাবে। কিন্তু স্বয়ংদীর্ণ আত্মার এই আকুল জিজ্ঞাসার উত্তর যাই হোক্ না কেন সুভাষের প্রিয় মরমী কবি এ. ঈ. র কথায়—

'চূর্ণিত মাণিক্য যদি খসি' পড়ে
বিলুপ্তির বুকে,
শিল্পীর প্রচেষ্টা তবু থামিবে না কভু,
ধ্বংসাবশেষের 'পরে জন্ম নিবে
আরো কোনো মহান্ সুন্দর।'

সুভাষের কয়েকটি চিঠি

(১)

মান্দালয় জেল

প্রিয় দিলীপ, ২।৫।২৫

তোমার ২৪।৩।২৫ তারিখের চিঠি পেয়ে আনন্দিত হয়েছি। তুমি আশঙ্কা করেছিলে যে মাঝে মাঝে যেমন ঘটে এবারও বুঝি তেমনি চিঠিখানাকে "double distillation"-এর ভিতর দিয়ে আসতে হবে; কিন্তু এবার তা হয়নি এবং সেজন্য খুবই সুখী হয়েছি।

তোমার চিঠি হৃদয়তন্ত্রীকে এমনই কোমলভাবে স্পর্শ ক'রে চিন্তা ও অনুভূতিকে অনুপ্রাণিত করেছে যে আমার পক্ষে এর উত্তর দেওয়া সুকঠিন। এ চিঠিখানাকে যে আবার "censor" এর হাত অতিক্রম করে যেতে হবে সেও আর এক অসুবিধা; কেন না এটা কেউ চায় না যে তার অন্তরের গভীরতম প্রবাহগুলি দিনের উন্মুক্ত আলোতে প্রকাশিত হয়ে পড়ুক। তাই এই পাথরের প্রাচীর ও লৌহদ্বারের অন্তরালে বসে আজ যা ভাবছি ও যা অনুভব করছি তার অনেকখানিই কোনও এক ভবিষ্যৎকাল পর্য্যন্ত অকথিত রাখতে হবে।

আমাদের মধ্যে এতগুলি যে অকারণে বা কোনো সম্পূর্ণ অজ্ঞাত কারণে জেলে আছি সেই চিন্তা তোমার প্রবৃত্তি ও মার্জিত রুচিকে আঘাত করবে এটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কিন্তু ঘটনাগুলি যখন মেনে চলতেই হচ্ছে তখন সমস্ত ব্যাপারটাকে আধ্যাত্মিক দিক দিয়েও দেখা যেতে পারে। একথা আমি বলতে পারি না যে জেলে থাকাটাই আমি পছন্দ করি—কেন না সেটা নিছক ভণ্ডামি হয়ে পড়ে। আমি বরং আরও বলি যে কোনো ভদ্র বা সুশিক্ষিত ব্যক্তি কারাবাস পছন্দ করতেই পারেন না। জেলখানার সমস্ত আবহাওয়াটা মানুষকে যেন বিকৃত ও অমানুষ করে তোলারই উপযোগী এবং আমার বিশ্বাস এ কথাটা সকল জেলের পক্ষেই খাটে। আমার মনে হয় অপরাধীদের অধিকাংশেরই কারাবাসকালে নৈতিক উন্নতি হয় না,

বরং তারা যেন আরও হীন হয়ে পড়ে। একথা আমাকে বলতেই হবে যে এতগুলো জেলে বাস করার পর কারাশাসনের একটা আমূল সংস্কারের একান্ত প্রয়োজনের দিকে আমার চোখ খুলে গেছে এবং ভবিষ্যতে কারা-সংস্কারই আমার একটা কর্ত্তব্য হবে। ভারতীয় কারাশাসনের প্রণালী একটা খারাপ (অর্থাৎ বৃটিশ প্রণালীর) আদর্শের অনুকরণ মাত্র, ঠিক যেমন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একটা খারাপ (অর্থাৎ লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের) আদর্শের অনুকরণ। কারাসংস্কার বিষয়ে আমাদের বরং আমেরিকার ইউনাইটেড স্টেট্‌সের মত উন্নত দেশগুলির ব্যবস্থাই অনুকরণ করা উচিত।

এই ব্যবস্থার যেটি সবচেয়ে বড় প্রয়োজন, সে হচ্ছে একটা নূতন প্রাণ বা, যদি বল, একটা নূতন মনোভাব; এবং অপরাধীদের প্রতি সহানুভূতি। অপরাধীদের প্রবৃত্তিগুলিকে মানসিক ব্যাধি বলেই ধরতে হবে এবং সেইভাবেই তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত। প্রতিষেধ-মূলক দণ্ডবিধি—যেটা কারাশাসনের ভিতরের কথা বলে ধরা যেতে পারে—তাকে এখন সংস্কারমূলক নূতন দণ্ডবিধির জন্যে পথ ছেড়ে দিতে হবে।

আমার মনে হয় না, আমি যদি স্বয়ং কারাবাস না করতাম তাহলে একজন কারাবাসী বা অপরাধীকে ঠিক সহানুভূতির চোখে দেখতে পারতাম। এবং এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ যে আমাদের দেশের আর্টিস্ট বা সাহিত্যিক-গণের যদি কিছু কিছু কারাজীবনের অভিজ্ঞতা থাকত তাহলে আমাদের শিল্প এবং সাহিত্য অনেকাংশে সমৃদ্ধ হ'ত। কাজী নজরুল ইস্‌লামের কবিতা যে তার জেলের অভিজ্ঞতার নিকট কতখানি ঋণী সে কথা বোধ হয় ভেবে দেখা হয় না।

আমি যখন ধীরভাবে চিন্তা করি তখন আমার নিঃসংশয় ধারণা জন্মে যে আমাদের সমস্ত দুঃখ কষ্টের অন্তরালে একটা মহত্তর উদ্দেশ্য কাজ করছে। যদি আমাদের জীবনের সকল মুহূর্ত্ত ব্যেপে এই ধারণাটা প্রসারিত হয়ে থাকত তাহলে দুঃখকষ্টের আর কোনোই যন্ত্রণা থাকত না, এবং বন্দী দশায়ও মানুষ আদর্শ সুখের দেখা পেত। কিন্তু তা ত সাধারণতঃ সম্ভব হয় না, এবং তাইতেই ত আত্মা ও দেহের মধ্যে এই অবিরাম দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলেছে।

সাধারণতঃ একটা দার্শনিক ভাব বন্দীদশায় মানুষের অন্তরে শক্তিসঞ্চার করে। আমি ত সেইখানেই আমার দাঁড়াবার ঠাঁই করে নিয়েছি এবং দর্শন বিষয়ে যতটুকু পড়াশুনা করা গেছে সেটুকু এবং জীবন সম্বন্ধে আমার যে ধারণা আছে তাও আমার বেশ কাজে লেগেছে। মানুষ যদি তার অন্তরে ভেবে দেখবার মত যথেষ্ট বিষয় খুঁজে পায়, বন্দী হ'লেও তার কষ্ট নেই, যদি তার স্বাস্থ্য অটুট থাকে। কিন্তু আমাদের কষ্ট ত শুধু আধ্যাত্মিক নয়—সে যে শরীরেরও কষ্ট; এবং আত্মা প্রস্তুত থাকলেও, দেহ যে সময়ে সময়ে দুর্ব্বল হয়ে পড়ে। ৺লোকমান্য তিলক কারাবাস-কালে গীতার সমালোচনা লেখেন, এবং আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, মনের দিক দিয়ে তিনি সুখে দিন কাটিয়েছিলেন। কিন্তু এ বিষয়ে আমার নিশ্চিত ধারণা যে মান্দালয় জেলে ছ'বছর বন্দী হ'য়ে থাকাটাই তাঁর অকাল মৃত্যুর কারণ।

এ কথা আমাকে বলতেই হবে যে, জেলের মধ্যে যে নির্জ্জনতায় মানুষকে বাধ্য হয়ে দিন কাটাতে হয় সেই নির্জ্জনতাই তাকে জীবনের চরম সমস্যাগুলি তলিয়ে বুঝবার সুযোগ দেয়। আমার নিজের সম্বন্ধে একথা বলতে পারি যে আমাদের ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত জীবনের অনেক জটিল প্রশ্নই বছর খানেক আগের চেয়ে এখন যেন অনেকটা সমাধানের দিকে পৌঁছাচ্ছে। যে সমস্ত মতামত একসময়ে নিতান্ত ক্ষীণভাবে চিন্তা বা প্রকাশ করা যেত, আজ যেন সেগুলো বেশ স্পষ্ট ও পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। আর কোন কারণে না হলেও শুধু এই জন্যেই আমার মেয়াদ শেষ হওয়া পর্য্যন্ত আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে অনেকখানি লাভবান হ'তে পারব।

আমার কারাবাস ব্যাপারটিকে তুমি একটা "martyrdom" বলে অভিহিত করেছ। অবশ্য ও কথাটা তোমার গভীর অনুভূতির ও প্রাণের মহত্ত্বের পরিচায়ক। কিন্তু আমার সামান্য কিছু 'humour' বা 'proportion'-এর জ্ঞান আছে (অন্ততঃ আশা করি যে আছে) এবং নিজেকে martyr মনে করার মত স্পর্দ্ধা আমার নেই। স্পর্দ্ধা বা আত্মম্ভরিতা জিনিসটাকে আমি সম্পূর্ণ এড়িয়ে যেতে চাই। অবশ্য সে বিষয়ে কতখানি সফল হয়েছি

তা শুধু আমার বন্ধুরাই বলতে পারেন। তাই martyrdom জিনিসটা আমার কাছে বড় জোর একটা আদর্শই হতে পারে।

আমার বিশ্বাস বেশীদিনের মেয়াদীর পক্ষে সবচেয়ে বড় বিপদ এই যে আপনার অজ্ঞাতসারে তাকে অকালবার্দ্ধক্য এসে চেপে ধরে, সুতরাং এদিকে তার বিশেষ সতর্ক থাকাই উচিও। তুমি ধারণাই করতে পার না কেমন করে মানুষ দীর্ঘকাল কারাবাসের ফলে ধীরে ধীরে দেহে ও মনে অকালবৃদ্ধ হয়ে থাকে। অবশ্য অনেকগুলি কারণই এর জন্য দায়ী—যথা, খারাপ খাদ্য, ব্যায়াম বা স্ফূর্ত্তির অভাব, সমাজ হতে বিচ্ছিন্ন থাকা, একটা অধীনতার শৃঙ্খলভার, বন্ধুজনের অভাব, এবং সঙ্গীতের অভাব·যা সর্বশেষে উল্লিখিত হলেও একটা মস্ত অভাব। কতকগুলি অভাব আছে যা মানুষ ভেতর থেকে পূর্ণ করে তুলতে পারে, আবার কতকগুলি আছে যা বাইরের বিষয় দিয়ে পূর্ণ করতেই হয়। এইসব বাইরের বিষয়গুলি থেকে বঞ্চিত হওয়াটা অকাল বার্দ্ধক্যের জন্য বড় কম দায়ী নয়। আলিপুর জেলে ইউরোপীয় বন্দীদের জন্য সঙ্গীতের সাপ্তাহিক বন্দোবস্ত আছে কিন্তু আমাদের নেই। পিক্‌নিক্, বিশ্রম্ভালাপ, সঙ্গীতচর্চ্চা, সাধারণ বক্তৃতা, খোলা জায়গায় খেলাধূলা করা, মনোমত কাব্যসাহিত্যের চর্চ্চা—এই সমস্ত বিষয় আমাদের জীবনকে এতখানি সরস ও সমৃদ্ধ করে তোলে যে আমরা সচরাচর তা বুঝতে পারি না, এবং যখন আমাদের জোর ক'রে বন্ধ ক'রে রাখা হয় তখনই তাদের মূল্য বুঝতে পারা যায়। যত দিন জেলের মধ্যে বেশ স্বাস্থ্যকর ও সামাজিক বিধি ব্যবস্থার বন্দোবস্ত না হয় ততদিন কয়েদীদের সংস্কার হওয়া অসম্ভব এবং ততদিন জেলগুলি আজকালকার মত নৈতিক উন্নতির পথে অগ্রসর না হয়ে অবনতিরই কেন্দ্র হয়ে থাকবে।

একথা আমার লিখতে ভোলা উচিত নয় যে আপনার নিজের লোকের, বন্ধুবান্ধবের এবং সর্ব্বসাধারণের সহানুভূতি এবং শুভেচ্ছা জেলের মধ্যেও অনেকখানি সুখ দিতে পারে। এই দিকের প্রভাবটা নিতান্ত অজ্ঞাতসারে ও সূক্ষ্মভাবে কাজ করলেও নিজের মনটাকে আমি বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাই যে এইভাবটা কিছুতেই কম বাস্তব নয়। সাধারণ ও রাজনৈতিক অপরাধী-দের অদৃষ্টের পার্থক্যের এটা একটা নিশ্চিত কারণ। যে রাজনৈতিক অপরাধী

সে জানল যে মুক্তি পেলে সমাজ তাকে বরণ করে নেবে। কিন্তু সাধারণ অপরাধীর তেমন কোনো সান্ত্বনা নেই। সে বোধ হয় তার বাড়ী ছাড়া আর কোথাও কোনো সহানুভূতিই আশা করতে পারে না। এবং সেই জন্য সে সাধারণের কাছে মুখ দেখাতে লজ্জা পায়। আমাদের Yard-এ যে সমস্ত কয়েদীদের কাজ করতে হয় তাদের কেউ কেউ আমাকে বলে যে তাদের নিজের লোকেরা জানেই না যে সে জেলে বন্দী, লজ্জায় তারা বাড়ীতে কোনো সংবাদও দেয় নি। এ ব্যাপারটি আমার কাছে নিতান্ত অসন্তোষজনক বলে মনে হল। সভ্য সমাজ অপরাধীদের প্রতি আরও সহানুভূতি কেন দেখাবে না?

আমার জেলের অভিজ্ঞতা বা তার থেকে যে সমস্ত চিন্তা মনে আসে সে সম্বন্ধে পাতার পর পাতা লিখে যেতে পারি কিন্তু একটা চিঠির ত শেষ আছে। আমার যদি বেশী শক্তি ও উদ্যম থাকৃত তাহলে একখানা বই লিখে ফেলার চেষ্টা করতাম কিন্তু সে চেষ্টার উপযুক্ত সামর্থ্য আমার নাই।

আমাদের জেলের কষ্ট দৈহিক অপেক্ষা বেশিরকম মানসিক বলে মনে করার আমি পক্ষপাতী। যেখানে অত্যাচার বা অপমানের আঘাত যথাসম্ভব কমে আসে সেখানে বন্দীজীবনটা তত যন্ত্রনাদায়ক হয় না। এই সমস্ত সূক্ষ্মধরণের আঘাত উপর হতেই আসে। জেলের কর্ত্তাদের এ বিষয়ে বিশেষ কিছু হাত থাকে না। আমার অন্ততঃ এই রকমই অভিজ্ঞতা। এই যে সব আঘাত বা উৎপীড়ন এগুলো আঘাতকারীর প্রতিই মানুষের মনকে আরও বিমুখ করে দেয় এবং সেদিক দিয়ে দেখলে মনে হয় এগুলোর উদ্দেশ্যও ব্যর্থ হয়। কিন্তু পাছে আমরা আমাদের পার্থিব অস্তিত্ব ভুলে যাই এবং নিজেদের অন্তরের মধ্যে একটা আদর্শ আনন্দধাম গড়ে তুলি তাই এইসব আঘাত আমাদের উপর বর্ষণ করে আমাদের স্বপ্নাবিষ্ট আত্মাকে জাগিয়ে তুলে দেখিয়ে দেয় যে আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা কি কঠোর ও নিরানন্দময়।

তুমি বলেছ যে মানুষের অশ্রু দিনের পর দিন কেমন ক'রে সমস্ত পৃথিবীর মাটিকে একেবারে তলা পর্য্যন্ত ভিজিয়ে দিচ্ছে—এই দৃশ্য তোমায় প্রতিদিন গম্ভীর ও বিষণ্ণ ক'রে তুলছে। কিন্তু এ অশ্রু সবটুকুই দুঃখের অশ্রু নয়। তার মধ্যে করুণা ও প্রেমবিন্দুও আছে। সমৃদ্ধতর ও প্রশস্ততর আনন্দ-

স্রোতে পৌছবার সম্ভাবনা থাকলে কি তুমি কষ্টের ছোটখাট ঢেউগুলি পার হয়ে যেতে অরাজি হতে? আমি নিজে ত দুঃখবাদ বা নিরুৎসাহের কোন কারণ দেখি না। বরং আমার মনে হয় দুঃখ ও যন্ত্রণা উন্নততর কর্ম্ম ও উচ্চতর অনুপ্রেরণা এনে দেবে। তুমি কি মনে কর বিনা দুঃখ কষ্টে যা লাভ করা যায় তার কোন মূল্য আছে?

তুমি কিছু দিন পূর্ব্বে যে সব বই পাঠিয়েছিলে তার সবগুলি পেয়েছি। সেগুলি ফেরৎ পাঠানো সম্ভব নয়, অনেক পাঠক জুটেছে। তোমার পছন্দ যে রকম সুন্দর তাতে একথা বলা অনাবশ্যক যে আরও বই সাদরে গৃহীত হবে।

---

(২) মান্দালয় জেল

২৫।৬।২৫

আমার শেষ চিঠির পরে তোমার কাছ থেকে সর্ব্বসমেত তিনখানি চিঠি পেয়েছি। চিঠিগুলোর তারিখ হচ্ছে ৬ই মে, ১৫ই মে, ও ১৫ই জুন।

তোমার প্রেরিত বইএর শেষ পার্শেলটা পেয়েছি। টুর্গেনিভের Smoke বইটা পাইনি। আপিসে পার্শেলটি খোলা হয়েছিল সুতরাং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে এ বিষয়ে খোঁজ নিতে বলেছি। দরকার হ'লে কলকাতায় C. I. D, আপিসে তিনি খোঁজ করবেন। তুমিও D.I.G., C.I,D.কে লিখে এ বিষয়ে তাঁদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পার।

Bertrand Russel-এর Prospect of Industrial Civilisationখানি বহরমপুর জেলে কয়েকজন কয়েদীর কাছে আছে। আমাদের যখন স্থানান্তরিত করা হয় তখন অনেকেই সেই বইখানা কাছে রাখবার আগ্রহ প্রকাশ করেন, আর বাস্তবিক একজন তখনও বইটা পড়ছিলেন। বইখানা তোমার দরকার হবে সেকথা না জেনে সেখানে রেখে এসেছিলাম। রাসেলের বইগুলির আদর এত বেশি যে একখানা পেলে কেউ শীঘ্র ছাড়তে চায় না। বহরমপুর জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে আজ লিখলাম তিনি যেন বইখানি তোমাকেই পাঠিয়ে দেন। তুমিও তাঁকে লিখতে পারো তাতে কাজটার তাগাদা হবে। তোমার এত দরকারের সময় বইখানা আটকে রাখার জন্য

বিশেষ দুঃখিত, কিন্তু তুমি বুঝতে পারছ না এত অসুবিধার কথা আগে ভেবে উঠতে পারিনি। 'Free Thought and Official Propaganda' ত আমার কাছে নেই—এ বইটা তুমি আমাকে পাঠাও নি।

বই বেছে দেওয়ার জন্য তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। আমরা সকলে আশা করি তুমি যে কাজ আরম্ভ করেছ ভগবানের ইচ্ছায় তা ভালভাবেই চল্‌বে। তোমার লেখাগুলি যে আমি সসম্মানে পাঠ করব সেকথা বিশেষ ক'রে বলার প্রয়োজন বোধ হয় নেই। বই প্রকাশ করবার সময় প্রচ্ছদপটের দিকে যেন নজর রেখ। এই মাত্র একখানা হালের বঙ্গবাণীতে তোমার লেখা রবীন্দ্রনাথের ওপর একটা প্রবন্ধ দেখলাম। আমি এখনও সেটা পড়িনি কিন্তু বিষয়টা চিত্তাকর্ষক বলেই বোধ হল।

তুমি জান আজকের দিনে কিসে আমার মন আচ্ছন্ন হয়ে আছে, আমার বিশ্বাস আমাদের সকলেরই আজ একই চিন্তা—সে হচ্ছে মহাত্মা দেশবন্ধুর দেহত্যাগ। কাগজে যখন এই দারুণ দুঃসংবাদ দেখি তখন এ দুটো চোখকে বিশ্বাস করতে পারিনি। কিন্তু হায়, সংবাদটা নিতান্তই নির্ম্মম সত্য। আমরা সমগ্র জাতিটাই যেন নিতান্ত হতভাগ্য ব'লে মনে হচ্ছে।

যে সব চিন্তা আমার অন্তরকে তোলপাড় করেছে সে সব চিন্তাগুলি বাইরে প্রকাশ ক'রে মনকে লাঘব করতে চাইলেও আমায় কষ্টের সহিত সংযত হ'তে হবে। যে সব চিন্তা আজ মনে উদয় হচ্ছে সেগুলি এত পবিত্র, এত মূল্যবান যে অচেনা কোনো মানুষের সামনে তা প্রকাশ করা যায় না—আর censor-দের ত অচেনা অজানা মনে না ক'রে পারি না। আমি শুধু এই কথাই বলতে চাই যে সমগ্র দেশের ক্ষতি যদি অপূরণীয়ই হয়ে থাকে, বাংলার যুবকদের পক্ষে এ একটা বড় সর্ব্বনাশ—সত্যই এটা স্তম্ভিত ক'রে দিয়েছে।

আজকের দিনে এত বিচলিত ও শোকাচ্ছন্ন হয়েছি এবং সেই সঙ্গে মনোজগতে সেই স্বর্গীয় মহাত্মার এত কাছাকাছি নিজেকে অনুভব করছি যে তাঁর গুণাবলী বিশ্লেষণ ক'রে তাঁর সম্বন্ধে কিছু লেখা মোটেই সম্ভব নয়। আমি তাঁর অত্যন্ত কাছে থেকে নিতান্ত অসতর্ক মুহূর্ত্তগুলিতে তাঁর যে ছবি দেখেছিলাম সময় এলে জগতের সামনে তার কথঞ্চিত আভাস দিতে পারব আশা করি। তাঁর সম্বন্ধে

আমার মত যাঁরা অনেক কথাই জানেন, তাঁরা পারলেও আজ কিছু বলতেই সাহস করছেন না, কেন না, আশঙ্কা হয়, তাঁর মহত্ত্বের সম্পূর্ণ পরিচয় দিতে না পেরে তাঁকে ছোট ক'রে ফেলেন।

তুমি যখন ফলতঃ এই কথাই বল যে দুঃখকষ্টের শেষ শুধু দুঃখকষ্টই নয়, তখন আমি তোমার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। জীবনে অবশ্য এমন সমস্ত ট্রাজেডী আছে—এই যেমন এখন একটা আমাদের উপর এসে পড়েছে, যেগুলিকে আমি সানন্দে বরণ করে নিতে পারি না। আমি এত বড় তত্ত্বজ্ঞানী বা এতবড় ভণ্ড নই যে বলব, আমি সকল প্রকার দুঃখ কষ্টই আমার সমগ্র হৃদয় দিয়ে বরণ ক'রে নিতে সক্ষম। সঙ্গে সঙ্গে একথাও ভেবে দেখতে হয় যে কতকগুলি এমন হতভাগ্যও আছে—হয়ত তারা সত্যসত্যই ভাগ্যবান—যারা সকল রকম দুঃখকষ্ট ভোগ করবার জন্যই নির্দ্দিষ্ট আছে। বেশি কম যাই হোক, যদি কাউকে পাত্র ভ'রে দুঃখ পান করতে হয় তাহলে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলিয়ে দিয়ে পান করাই ভালো। এমনি একটা আত্মনিবেদন বা আত্মসমর্পণের ভাব চীনের প্রাচীরের মত অদৃষ্টের সমস্ত আঘাত একেবারে ব্যর্থ ক'রে দিতে নাও পারে কিন্তু এতে নিশ্চয়ই আমাদের স্বাভাবিক সহিষ্ণুতার শক্তি অনেকখানি বাড়িয়ে তোলে। Bertrand Russel যখন বলছেন যে জীবনে এমন সমস্ত ট্রাজেডি আছে যার হাত থেকে মানুষ নিষ্কৃতিই পেতে চায়, তখন ত তিনি খাঁটি সংসারী মানুষের অভিমতই প্রকাশ করছেন। এবং আমার বিশ্বাস যে, কেবল নিষ্কলঙ্ক সাধু ব্যক্তি অথবা সাধুত্বের ভাণ করে যে ভণ্ড সে-ই একথার প্রতিবাদ করবে।

যারা ভাবুক বা তত্ত্বজ্ঞানী নয় তাদের যন্ত্রণাটা সম্পূর্ণ নিরবচ্ছিন্ন মনে করাটা তোমার হয়ত ঠিক হচ্ছে না। তত্ত্বজ্ঞানহীনদের (abstract point of view থেকে তাদের আমি তত্ত্বজ্ঞানহীনই বলব) নিজেদেরও একটা আদর্শবাদ আছে। তারা তাকে পূজার সামগ্রী বলে মনে ক'রে শ্রদ্ধা করে ও ভালোবাসে; নানাপ্রকার দুঃখযন্ত্রণার সঙ্গে যুদ্ধ করবার সময় সেই ভালোবাসার উৎস হ'তেই তারা সাহস ও ভরসা পায়। এখানে আমার সঙ্গে যারা কারাযন্ত্রণা ভোগ করছে তাদের মধ্যে অনেকে এমন আছে

যারা ভাবুক বা দার্শনিক নয়, তবুও তারা শান্তভাবে যন্ত্রণা ভোগ করে এবং বীরের মত সব সহ্য করে। Technical অর্থে দার্শনিক না হতে পারে কিন্তু তাদের আমি সম্পূর্ণরূপে ভাববিবর্জিত মনে করতে পারি না। সম্ভবতঃ জগতের সর্বত্র যারা কর্মী তাদের সম্বন্ধে সাধারণতঃ একথা খাটে।

সাধারণের মনে একটা ধারণা আছে, অপরাধীদের ফাঁসিকাঠে নিয়ে যাওয়ার সময় তাদের একটা স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য আসে এবং যারা কোনো মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রাণ দেয় তারাই বীরের মত মরতে পারে। এ ধারণাটা ঠিক নয়। এ সম্বন্ধে আমি কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছি এবং এই সিদ্ধান্তে পৌছেছি যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপরাধীরা সাহসের সহিত প্রাণ দেয় এবং ফাঁসির দড়ি তাদের গলায় বসবার আসেই ভগবানের পায়ে আত্ম-নিবেদন করে। একেবারে ভেঙে মুচ্ড়ে পড়াটা বড় একটা দেখা যায় না। একবার এক কারাধ্যক্ষ আমায় বলেছিলেন যে একজন ফাঁসির কয়েদী তাঁর কাছে স্বীকার ক'রেছিল যে সে একজনকে হত্যা করেছিল। সে তার কাজের জন্য অনুতপ্ত কিনা প্রশ্ন করায় সে জবাব দিয়েছিল যে তার মোটেই কোনো অনুতাপ হয় নি কারণ হত ব্যক্তির বিরুদ্ধে তার ন্যায্য অনুযোগ ছিল। তারপর সে বীর দর্পে ফাঁসি কাঠে উঠেছিল এবং প্রাণ দিয়েছিল, কিন্তু একটি পেশীর সঙ্কোচনেও তার মুখের বিকৃতি হয় নি।

অপরাধীদের মনস্তত্ত্ব আলোচনা ক'রে আমার চোখ খুলে গেল। আমার বিশ্বাস যে তাদের উপর যথেচ্ছ অবিচার করা হয়।

সেবারে—অর্থাৎ ১৯২২ সালে যখন জেলে ছিলাম তখন এক কয়েদী আমাদের Yard-এ চাকরের কাজ করত। সে সময়ে আমি মহাপ্রাণ দেশবন্ধুর সঙ্গে একই কারাপ্রাঙ্গণে এক ঘরেই বাস করতাম। দেশবন্ধুর প্রাণটা ছিল খুবই কোমল, তাই সহজেই তিনি সেই কয়েদীর দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। সে একটা পুরানো পাপী, আটবার তার সাজা হয়। কিন্তু সেও কেমন করে নিজের অজ্ঞাতসারেই দেশবন্ধুর অনুরক্ত হয়ে পড়ে এবং আশ্চর্য্য-রকমের ভক্তির পরিচয় দেয়। কারামুক্তির সময় দেশবন্ধু তাকে বলেছিলেন যে জেল থেকে মুক্তি পেলে সে যেন বার বার তাঁর কাছে যায় আর তার

পুরানো সহচরদের ছায়া যেন না মাড়ায়। কয়েদীটি রাজি হয়েছিল ও কথামত কাজও করেছিল। তুমি শুন্‌লে আশ্চর্য্য হবে যে, যে ব্যক্তি একসময়ে পুরানো দাগী ছিল সে এখন উপরোক্ত ঘটনার পর থেকে তাঁর বাড়িতেই বাস করছে এবং মাঝে মাঝে অভদ্র মেজাজ তার দেখা দিলেও সে যে এখন একেবারে অন্য মানুষ তাই নয়, অধিকন্তু বেশ সরল ভাবেই জীবন কাটাচ্ছে; এবং আজ এই ক্ষতি যাদের সবচেয়ে বেশি বেজেছে তাদের মধ্যে সেও একজন। অনেকে বলেন যে মানুষের জীবনের ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ ঘটনা দিয়ে তার মহত্বের বিচার করা উচিত—একথা যদি সত্য হয় তবে তাঁর দেশের কাজের দিকটা বাদ দিলেও স্বর্গীয় দেশবন্ধু একজন মহাপুরুষ।

আমি আমার আসল বক্তব্য থেকে অনেক দূরে এসে পড়েছি এবং এখন আমার থামা উচিত। তোমার চিঠির জবাব লেখা এখনও শেষ করতে পারলাম না, কিন্তু আজকের ডাক ধরতে গেলে আমাকে এইখানেই শেষ করতে হয়। আমি জানি যে আমার খবর পাবার জন্য তুমি উদ্বিগ্ন থাকবে, সুতরাং আজকের ডাক ধরতেই হবে। পরের পত্রে আরও খবর লিখব।

---

(৩)

মান্দালয় জেল
৯।১০।২৫

এ কথা কিছুতেই মনে কোরো না যে, আমার দৃষ্টি নিতান্তই সঙ্কীর্ণ। "greatest good of the greatest number"-এতে আমি যথার্থ ই বিশ্বাস করি, কিন্তু সে "good" আমার কাছে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত নয়। অর্থনীতি বলে, মানুষের সকল কাজই হয় "productive' নয় "unproductive" তবে কোন্ কাজ যে "productive" তা নিয়ে অনেক বাক্‌বিতণ্ডা হয়ে থাকে। আমি কিন্তু কারুকলা বা সে সংক্রান্ত কোন প্রচেষ্টাকে unproductive মনে করি নে, আর দার্শনিক চিন্তা বা তত্ত্ব-জিজ্ঞাসাকে নিস্ফল বা নিরর্থক বলে অবজ্ঞা করি নে। আমি নিজে একজন আর্টিষ্ট না হ'তে পারি—আর সত্যি বলতে কি আমি জানি যে তা নই—কিন্তু সে জন্যে দোষী প্রকৃতি বা সাক্ষাৎ অবতার যাই বল আমি নই। অবশ্য যদি বল যে আর জন্মের কর্ম্মফল

এ জন্মে ভোগ করছি, তাহলে আমি নাচার। সে যাই হোক, এ জন্মে যে আর্টিস্ট হলুম না, তার কারণ, হতে পারলুম না; আর আমার বিশ্বাস, "শিল্পী জন্মায়,—তৈরী করা যায় না," একথা অনেকটা সত্য। কিন্তু নিজে আর্টিস্ট না হলেই যে আর্ট উপভোগ করা যায় না এমন কোন কথা নেই; আর কোন কলার সমঝদার হতে গেলে তাতে নিজের যেটুকু পরিমাণ দখল থাকার দরকার, আমার মনে হয় তা প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষেই সুলভ।

দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে এ আক্ষেপ কোরো না যে, সঙ্গীত নিয়ে তুমি সময়টা হেলায় কাটিয়ে দিচ্ছ, সেক্সপীয়রের কথায় বলতে গেলে "the time is out of joint।" বন্ধু, সারা দেশকে সঙ্গীতের বন্যায় প্লাবিত করে দাও, আর যে সহজ আনন্দ আমরা প্রায় হারিয়ে বসেছি তা আবার জীবনে ফিরিয়ে আনো। যার হৃদয়ে আনন্দ নেই, সঙ্গীতে যার চিত্ত সাড়া দেয় না, তার পক্ষে জগতে বৃহৎ কি মহৎ কিছু সম্পাদন করা কখনও কি সম্ভব? কার্লাইল বলতেন সঙ্গীতে যার প্রাণ নেই, সে করতে পারে না হেন দুষ্কার্য্য নেই, একথা সত্যি হোক আর না হোক, আমার মনে হয় যার প্রাণে সঙ্গীতের কোন সাড়া নেই, সে চিন্তায় বা কার্য্যে কখনও মহৎ হতে পারে না। আমাদের প্রত্যেক রক্তকণিকায় আনন্দের অনুভূতি সঞ্চারিত হোক এই আমরা চাই, কারণ আনন্দের পূর্ণতাতেই আমরা সৃষ্টি করতে পারি। আর সঙ্গীতের মত এমন আনন্দ আর কিসে দিতে পারে?

কিন্তু আর্ট ও তজ্জনিত আনন্দকে দরিদ্রতমের পক্ষেও সহজলভ্য করতে হবে। সঙ্গীতে বিশেষজ্ঞতার চেষ্টা অবশ্য ছোট ছোট গণ্ডীর মধ্যে চলবে, আর সে রকম চর্চ্চা হওয়াও উচিত; কিন্তু সঙ্গীতকে সর্ব্বসাধারণের উপযোগীও ক'রে তুলতে হবে। বিশিষ্ট সাধনার অভাবে আর্টের উচ্চ আদর্শ যেমন ক্ষুণ্ণ হয়, তেমনি জনসাধারণের কাছে সুগম না হলেওআর্ট এবং জীবনে বিচ্ছেদ ঘটে, আর তাতে আর্ট নির্জ্জিত ও খর্ব্বই রয়ে যায়। আমার মনে হয় লোকসঙ্গীত ও নৃত্যের (folk music and dancing) ভিতর দিয়েই আর্ট জীবনের সঙ্গে যোগ রাখে। ভারতবর্ষের জীবন ও আর্টের মধ্যে এই যোগটি পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রায় ছিন্ন করে ফেলেছে। অথচ

তার স্থানে নূতন কোন যোগসূত্র যে আমরা পেয়েছি তাও নয়। আমাদের যাত্রা, কথকতা, কীর্ত্তন প্রভৃতি যেন কোন অতীত যুগের স্মৃতিচিহ্ন মাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। বস্তুতঃ যদি আমাদের গুণী শিল্পীরা অচিরে আর্টকে পুনরায় জীবনের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত না করতে পারেন, তাহলে আমাদের চিত্তের যে কি দৈন্যদশা ঘটবে, তা ভাবলেও শিউরে উঠতে হয়। তোমার হয়ত মনে আছে তোমাকে আমি একবার বলেছিলুম যে, মালদার "গম্ভীরা" গানের সৌন্দর্য্যে আমি অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছিলাম। তাতে সঙ্গীত ও নৃত্য উভয়ই ছিল। বাঙলার অন্যত্র ওরূপ জিনিষ কোথাও আছে বলে ত আমি জানিনে; মালদাতেও ওর মৃত্যু শীঘ্রই অবশ্যম্ভাবী, যদি নতুন করে প্রাণশক্তি এতে সঞ্চারিত করবার চেষ্টা না হয়। আর বাঙলার লোকসঙ্গীতের উন্নতিকল্পে মালদায় তোমার শীঘ্রই যাওয়া উচিত। গম্ভীরার মধ্যে জটিল বা বিশাল বা মহৎ কিছু নেই,—তার গুণই এই যে তা সহজ, সাদাসিধে। আমাদের নিজস্ব **folk music** ও **folk dancing** একমাত্র এই মালদাতেই এখনও বেঁচে আছে আর সেই হিসেবেই গম্ভীরার যা মূল্য। সুতরাং যাঁরা ও প্রকার সঙ্গীত ও নৃত্য পুনর্জীবিত করতে চান, তাঁদের মালদা থেকে কাজ আরম্ভ করাই সুবিধা।

লোক-সঙ্গীত ও নৃত্যের দিক থেকে বর্ম্মা এক আশ্চর্য্য দেশ। খাঁটি দিশী নাচ ও গান এখনও পুরোদমে এখানে চলেছে, আর সুদূর পল্লীতে পর্য্যন্ত লক্ষ লক্ষ লোককে আমোদআহ্লাদের খোরাক জোগাচ্ছে। ভারতীয় সঙ্গীতের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি অনুশীলন করার পর, তুমি যদি ব্রহ্মদেশের চর্চ্চা কর ত' মন্দ হয় না। সে সঙ্গীত হয়ত তত সূক্ষ্ম বা উন্নত নয়, কিন্তু দরিদ্র ও অশিক্ষিতদের প্রচুর আনন্দ দান করবার যে ক্ষমতা তার আছে, আপাততঃ আমি তাতেই আকৃষ্ট হয়েছি। শুনি নাকি এখানকার নাচও বড় সুন্দর। বর্ম্মায় জাতিভেদ না থাকাতে এখানকার শিল্পকলার চর্চ্চা কোন শ্রেণীবিশেষের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নয়। ফলে বর্ম্মায় আর্ট চারিদিকে ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। বোধ হয় এই কারণে, আর লোক সঙ্গীত ও নৃত্যের প্রচলন থাকার দরুণ, ব্রহ্মদেশে ভারতবর্ষের চেয়ে জনসাধারণের মধ্যে সৌন্দর্য্যজ্ঞান অনেক বেশী পরিণতি লাভ করেছে। দেখা হলে এ বিষয়ে আরো কথা হবে।

দেশবন্ধুর সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে আমি একমত। আমিও সম্পূর্ণ মানি যে, অনেক সময়ে সমাজ বা রাষ্ট্রের বৃহৎ ক্ষেত্রের চেয়ে জীবনের ছোট খাটো ঘটনায় মানুষের মহত্ত্ব ঢের বেশী প্রকাশ পায়। দেশবন্ধুর ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়েছিলাম বলেই তাঁর প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা ভক্তি, ভালবাসা জন্মেছিল—দেশনেতা বলে তাঁর অনুগামী ছিলাম বলে নয়। তাঁর বেশীর ভাগ ভক্তেরও ঠিক আমার মতই হয়েছিল। বস্তুত, তাঁর সহকর্ম্মী ও অনুচর ছাড়া তাঁর অন্য কোন পরিজন ছিল না বললেই হয়। আমি তাঁর সঙ্গে জেলে আটমাস একসঙ্গে ছিলাম—দু' মাস পাশাপাশি ঘরে আর ছ মাস একই ঘরে। এইরূপে তাঁকে সম্পূর্ণ ঘনিষ্ঠভাবে জানবার সুযোগ পেয়েছিলাম—তাই ত তাঁর পদতলে আশ্রয় নিয়েছিলাম।

তুমি শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে যা লিখেছ, তার সবটা না হলেও বেশীর ভাগই আমি মানি। তিনি ধ্যানী, আর আমার মনে হয়, বিবেকানন্দের চেয়েও গভীর, যদিও বিবেকানন্দের প্রতি আমার শ্রদ্ধা প্রগাঢ়। আমিও তোমার কথায় সায় দিই যে, "নীরব ভাবনা, কর্ম্মবিহীন বিজন সাধনা" সময়ে সময়ে দরকার হয়, এমন কি দীর্ঘকালের জন্যেও। কিন্তু আশঙ্কা এই যে, সমাজের বা জীবনের স্রোত থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখলে মানুষের কর্ম্মের দিকটা পঙ্গু হয়ে যেতে পারে, আর তার প্রতিভার একপেশে বিকাশের ফলে সে সমাজবিচ্ছিন্ন অতিমানুষের মতন কিছু একটা হয়ে উঠতে পারে। অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন দুচার জন প্রকৃত সাধকের কথা অবশ্য আলাদা; কিন্তু বেশীর ভাগ লোকের পক্ষে কর্ম্ম বা লোকহিতই সাধনার একটা প্রধান অঙ্গ। নানা কারণে আমাদের জাতির কর্ম্মের দিকটা শূন্য হয়ে এসেছে। তাই এখন আমাদের দরকার রজোগুণের "double dose।" সাধক বা তাদের শিষ্যদের মধ্যে অতিরিক্ত চিন্তার ফলে ইচ্ছাশক্তি অসাড় যদি না হয়ে যায়, তাহলে নির্জ্জনে ধ্যান যতদিনের জন্য তারা করে করুক, আমি তাদের সঙ্গে ঝগড়া করতে যাব না।

কিন্তু আমরা যেন "Sicklied o'er with the pale cast of thought" না হয়ে পড়ি। সাধক নিজে হয়ত নিস্তেজকারী সকল প্রভাব এড়িয়ে চলতে

পারেন,—কিন্তু তাঁর চেলারা ? গুরুর সাধনপদ্ধতি কি সজ্ঞানে না হোক অজ্ঞানে তাদের কোন অনিষ্ট করবে না ?

আমি একথা সম্পূর্ণ মানি যে প্রত্যেকেরই নিজের ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশ করার চেষ্টা করতে হবে। নিজের মধ্যে যা সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তার দানই হচ্ছে প্রকৃত সেবা। আমাদের অন্তর প্রকৃতি, আমাদের স্বধর্ম্ম যখন সার্থকতা লাভ করে তখনই আমরা যথার্থ সেবার অধিকারী হই। এমার্সনের কথায় বলতে গেলে, নিজের ভেতর থেকেই আমাদের গড়ে উঠতে হবে ও তাতে আমরা সকলেই যে এ পথের পথিক হবো তার কোনো কথা নেই, যদিও একই আদর্শ হয়ত আমাদের অনুপ্রাণিত করবে। শিল্পীর সাধনা কর্ম্মযোগীর সাধনা থেকে ভিন্ন-তপস্বীর যে সাধনা বিদ্যার্থীর সে সাধনা নয়, কিন্তু আমার মনে হয় এ সকলের আদর্শই প্রায় একই। গোলাকার ব্যাক্তিকে চতুষ্কোণ গর্ত্তের মধ্যে পুরতে আর যেই চা'ক্ না কেন, আমি কখনই চাই নে। নিজের প্রতি সত্য হলে বিশ্বমানবের প্রতি কেউ অসত্য হতে পারে না। তাই আত্মোন্নতি ও আত্মবিকাশের পথ নিজের প্রকৃতিই দেখিয়ে দেবে। প্রত্যেক ব্যক্তি যদি নিজের শক্তি ও প্রকৃতি অনুসারে নিজেকে সার্থক করে তুলতে পারে, তাহলে অচিরেই সমগ্র জাতির নবজীবন দেখা দেয়। সাধনার অবস্থায় হয়ত মানুষকে এমনভাবে জীবন যাপন করতে হয়, যাতে তাকে বাইরে থেকে স্বার্থপর বা আত্মসর্ব্বস্ব মনে হতে পারে। কিন্তু সে অবস্থাতে মানুষ বিবেকবুদ্ধির দ্বারা চালিত হবে, বাইরের লোকের মতামত দ্বারা নয়। সাধনার ফল যখন প্রকাশিত হবে তখনই লোকে স্থায়ী বিচার করবে, সুতরাং আত্মবিকাশের সত্যপথ যদি অবলম্বন করা হয়ে থাকে, তাহলে লোকমত উপেক্ষা করা যেতে পারে। অতএব দেখা যাচ্ছে তোমার সঙ্গে আমার মতের যে বিশেষ পার্থক্য আছে, তা নয়।—ইতি

তোমার স্নেহবদ্ধ—সুভাষ

